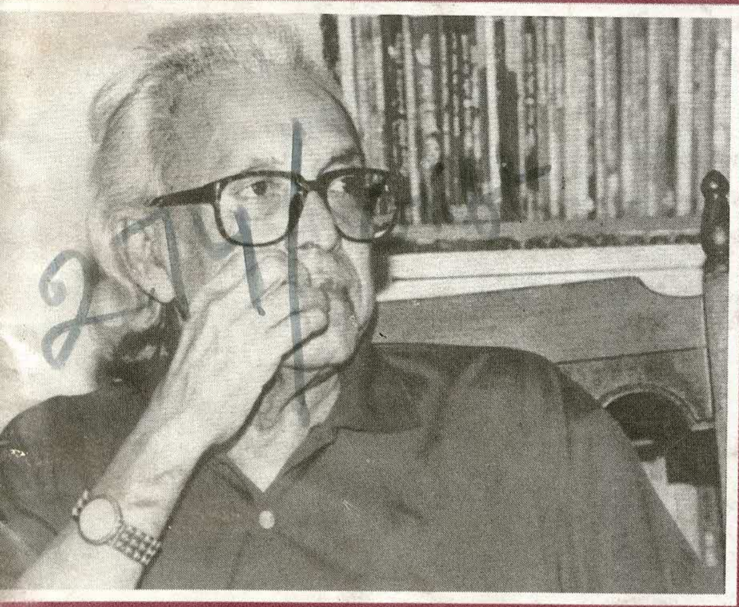
258

ত্রৈমাসিক জেলা বুলেটিন

আহ্বান

ত্রয়োদশ বর্ষ ❊ সাতচল্লিশতম সংখ্যা ❊ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬



শামসুর রাহমান

স্বাধীনতা তুমি

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা—
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল
স্বাধীনতা তুমি ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

THE BENGAL TEACHER'S ASSOCIATION · UNION IS STRENGTH

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখা

আহ্বান

ত্রৈমাসিক জেলা বুলেটিন
ত্রয়োদশ বর্ষ, সাতচল্লিশতম সংখ্যা (পঃ মেঃ-১৮)
জুলাই—সেপ্টেম্বর, ২০০৬

THE ALL BENGAL TEACHERS' ASSOCIATION
UNION IS STRENGTH

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখা
গোলোকপতি ভবন
রবীন্দ্রনগর ঃঃ পশ্চিম মেদিনীপুর
দূরভাষ—(০৩২২২) ২৭৫২৬৮

অপরেশ ভট্টাচার্য
সম্পাদক, 'আহ্বান'
ও
জেলা সম্পাদক
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

সূচিপত্র

আমাদের অঙ্গীকার

- বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ
- বড়, মাঝারি ও ছোট শিল্পে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুতের যোগান
- কৃষির অগ্রগতি ও সেচ ব্যবস্থার সার্বিক রূপায়ণে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদার সুষ্ঠু যোগান

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনজীবনে অগ্রগতির রূপকার

জেলা সমিতির আহ্বান

শারদীয় উৎসবের শেষে সবাইকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এবারও উৎসব সর্বজনীন রূপ পায় নি। আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ঐতিহ্য অনুসারে সমিতির সদস্যবন্ধুরা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। দায়িত্বশীল দায়বদ্ধ সদস্যবন্ধুদের প্রতি ধন্যবাদ।

আঞ্চলিকস্তরে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে বিগত বছরের কাজকর্মের মূল্যায়ন ও আগামী একবছরের দিক নির্দেশ স্থির হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মহকুমা ও জেলাস্তরের বর্দ্ধিত কমিটি সভায় অনুরূপভাবে বিগত একবছরের সাংগঠনিক ও আন্দোলন সংক্রান্ত কর্মসূচির পর্যালোচনা হয়েছে। পূর্বে এই কর্মসূচি আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয়স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই বার্ষিক সাধারণ সভা বা একবছরের কাজের মূল্যায়ন ও নতুন বছরের দিক্ নির্দেশের কর্মসূচি অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং বর্তমান সময়ে সংগঠনের সকল স্তরে এই কর্মসূচি পালনের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবেই সমিতির আন্দোলনের নতুন অভিমুখ নির্ণয় এবং প্রয়োজনীয় পথচলার সঠিক দিক্ নির্দেশে সহায়তা করবে। কেন্দ্রিয় কমিটির এই বাস্তবোচিত সিদ্ধান্তের জন্য আমাদের অভিনন্দন।

১৯৮০ খ্রিঃ কাঁথি রাজ্য সম্মেলনে সমিতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং মতাদর্শে— বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নির্দিষ্ট হয়। এই মতাদর্শ প্রচার করার ক্ষেত্রে সমগ্র শিক্ষক সমাজের ভূমিকা যাতে ইতিবাচক হয়ে উঠতে পারে সেজন্য সমিতির সাংগঠনিক দলিলে বিদ্যালয় ইউনিট গঠনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইউনিটগুলিকে সক্রিয়করণের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ হয়। ২০০৬ খ্রি. এই গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের ২৫ বছর পূর্তি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আঞ্চলিক স্তরের প্রতিটি বার্ষিক সাধারণ সভা এবং মহকুমা, জেলাস্তরের বর্ধিত কমিটির সভায় এই সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির পর্যালোচনা হয়েছে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে। আমাদের জেলায় সক্রিয় ও সচেতন ইউনিট গঠন এবং তার অগ্রগতির মূল্যায়ন প্রয়োজন। জেলা পর্যালোচনা সভায় বিদ্যালয় ইউনিটকে সময়োপযোগী ও সক্রিয়করণের আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

৯ অক্টোবর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অযৌক্তিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দল পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের অনুকূল পরিবেশ ধ্বংস করতে ১২ ঘন্টার বনধ্ ডাকে। উদ্দেশ্য সিঙ্গুরে টাটা কোম্পানীর প্রস্তাবিত মোটরগাড়ী তৈরির কাজে বিরোধীতা। সবাই জানেন শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক জাগরণ সম্ভব নয়। কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যত ধ্বংসসাধনে ওরা মরীয়া। রাজ্যের মানুষ মূল্যবোধহীন রাজনৈতিক দলের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন।

সমিতির আহ্বানে ৩ নভেম্বর রাণী রাসমণি রোডে কেন্দ্রিয় সমাবেশ হবে। উক্ত সমাবেশ সফল করার আহ্বান জানাই।

আগামী ২৪ ডিসেম্বর সমিতির ৮১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রিয় নেতৃত্ব সভায় উপস্থিত থাকার আহ্বান রেখেছেন। সবাইকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

২১ নভেম্বর থেকে টেস্ট পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক টেস্টপরীক্ষা যাতে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য সকলকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানাই। পরীক্ষা গ্রহণের পর অধিকতর আন্তরিকতায় উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করে দেওয়ার আহ্বান থাকল।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ ২০০৭ এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মূল্যায়নে প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে গ্রেডেশান পদ্ধতিতে ফলপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গ্রেডেশান মূল্যায়নের অধিকতর ত্রুটিমুক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কিন্তু শিক্ষক-অভিভাবক-ছাত্রদের এ সম্পর্কে সচেতন করার কোনো কর্মসূচি সংসদ গ্রহণ করেন নি। দায়িত্বশীল সংগঠন হিসেবে সমিতিকে সংসদের পক্ষে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এর উপযোগিতা বোঝানোর দায়িত্ব নিতে হবে।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠক্রম-পাঠ্যসূচি বিভাজনের পর ২০০৬-এর একাদশ শ্রেণির বাৎসরিক পরীক্ষা নিজ নিজ বিদ্যালয়ে গৃহীত হলেও সংসদ ঐ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী করে প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিদ্যায়গুলিতে পৌছে দিয়েছেন। পরীক্ষার প্রশ্ন থাকত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্রে। প্রতিদিন প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রশ্ন পৌছে দেওয়ার এই পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই প্রচণ্ড উদ্বেগের সৃষ্টি করে। এই অভিজ্ঞতা থেকে সংসদ ২০০৭-এর বাৎসরিক পরীক্ষা দ্বাদশ শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষার অনুরূপ এক-একটি পরীক্ষাকেন্দ্র নির্দিষ্ট করে সেখানে পরীক্ষা গ্রহণের কর্মসূচি নিয়েছেন বলে জানা গেছে। একাদশ শ্রেণির বিভাজিত পাঠক্রমের বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। যদিও পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের দায়িত্ব পূর্বের মতো সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদেরই নিতে হচ্ছে। এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কতখানি বাস্তবোচিত হবে এবং কেন বাৎসরিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীরা অন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে দেবে—এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। বিষয়টি সম্পর্কে আরো চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন। সমিতির অভিমত, সংসদের ব্যবস্থাপনায় দ্বাদশ শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষার অনুরূপ একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন প্রয়োজন। অর্থাৎ সংসদের দায়িত্বে দু'টি সেমেস্টারে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা বিজ্ঞানসম্মত। সংশ্লিষ্ট সকলকে মতামত জানানোর অনুরোধ জানাই।

৩১ অক্টোবর, ২০০৬

অমরেশ চক্রবর্তী

CABE-র বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদনে নম্বরের প্রতি এই মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরতাকেই পরীক্ষাব্যবস্থার মূল ত্রুটি বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং আরো বেশি নির্ভরযোগ্য এবং উপযুক্ত একটি বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এই বিষয়ে পর্যালোচনা ও অন্যতর ব্যবস্থার সন্ধান অন্যান্য দেশে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে ঐ পুস্তিকায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগের (UGC) ১৯৬২ সালের পরীক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত একটি সুপারিশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল নম্বর দেওয়া এবং বিভিন্ন বিষয়ের নম্বর একত্র করার একটি নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি প্রণয়ন। এর প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল কিছু সংখ্যাতত্ত্ব বা পরিসংখ্যানের প্রক্রিয়া। নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়নের যেটা সর্বজনস্বীকৃত দুর্বলতা তা হ'ল তার আত্মগত চরিত্র বা ব্যক্তিগত ধারণা ও বিশ্বাসের প্রভাব। এই ব্যক্তিগত ঝোঁকের ফলেই একই উত্তরপত্র বিভিন্ন পরীক্ষকের হাতে ভিন্ন ভিন্ন নম্বর পায়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থেকে যায়। অবশ্যই এই বিভিন্নতা সাহিত্য বা মানবিক বিদ্যার ক্ষেত্রে যতটা হয় গণিত বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ততটা হয় না, কারণ সেখানে উত্তরের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মতামতের অবকাশ কম। ব্যক্তির মনের প্রাধান্য দূর করে বিভিন্ন পরীক্ষকের দেওয়া নম্বরের মধ্যে সঙ্গতি সাধন করাই পরীক্ষা সংস্কারের প্রধান স্তম্ভ। এই লক্ষ্যে সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার আগে প্রশ্নপত্র রচনা ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের বিষয়ে কিছু পরিশীলিত পদক্ষেপের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে যেগুলি সুবিদিত এবং আমাদের রাজ্য সহ প্রায় সব রাজ্যের পরীক্ষা ব্যবস্থাপকরা এগুলি যথাসম্ভব অনুসরণ করেন।

বিভিন্ন পরীক্ষকের মূল্যায়নকে একটি সাধারণ মান-এ নিয়ে আসার জন্য যে প্রক্রিয়ার কথা বলা হয় তার নাম 'scaling'; বাংলায় বলা যায় শ্রেণিবিন্যাস বা বর্গীকরণ। এ জন্য যেমন কয়েকটি গাণিতিক প্রক্রিয়ার সুপারিশ করা হয়, তেমনই তাদের নির্ভরযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। যে সব শর্ত পূরণ হলে এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগ সম্ভব হতে পারে সেই শর্তাবলী বাস্তবে কখনই পূরণ করা যায় না। তাই যতগুলি বিকল্প পদ্ধতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তার সবকটির বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায় অলংঘনীয় বাধার কথাও অন্য বিশেষজ্ঞের বিবেচনায় উঠে এসেছে।

এন সি ই আর টি-র পুস্তিকায় প্রদত্ত বিশ্লেষণের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরীক্ষামূলক গবেষণালব্ধ ফলাফল। সেই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষকদের নিজ নিজ প্রবণতার প্রভাব থেকে তাঁদের দেওয়া নম্বরকে মুক্ত করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় হিসেবে ঐ গবেষণার প্রতিবেদনে বেশ কয়েকটি জটিল গাণিতিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্যতার কথা বলা হয়েছে। তবে ১৯৬০-এর দশকে পরিচালিত এই গবেষণায় কত সংখ্যক পরীক্ষার্থীর কথা ভাবা হয়েছিল, পরবর্তী কালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল কিনা, করে থাকলে কী সুফল পাওয়া গিয়েছিল—এসব বিষয়ে এন সি ই আর টি-র দলিলে কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু উল্লেখ আছে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত অধ্যাপক ভি. এম. দাস্তেকারের একটি গবেষণা পত্রের কথা যেখানে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রটির পর্যালোচনা করা হয়েছে। অধ্যাপক দাস্তেকারের লেখায় সহস্রাধিক পরীক্ষককে জড়িয়ে বিশালায়তন কোনো পরীক্ষা যজ্ঞে এই পদ্ধতিকে ফলপ্রসূ করার সম্ভাব্যতা নিয়ে গভীর সংশয়ের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি দেখিয়েছেন, যে সব পূর্বশর্ত পূরণ হলে এই পদ্ধতির প্রয়োগ কিছুটা সার্থক হতে পারে বিরাট আকারের পরীক্ষার ক্ষেত্রে তা কখনই সম্ভব নয়। বিভিন্ন পরীক্ষকের দেওয়া নম্বরকে একটি অভিন্ন ধাঁচায় নিয়ে আসার পথে বহুবিধ প্রতিবন্ধক আছে যার সবগুলি নিরসন করা কোনো প্রক্রিয়াতেই সম্ভব নয়। তাছাড়া, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত ধাঁচাটি নির্মাণের সময় মাত্র কয়েকটি সমস্যার কথা বিবেচনা করা হয়েছে। আরো বহুবিধ বাধা আছে যা দূর করা, এমন কি সবগুলি বিবেচনায় আনাও সম্ভব নয়। তাই কয়েক হাজার পরীক্ষকের মূল্যায়নকে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলার প্রক্রিয়াটির সফল প্রয়োগ প্রায় অসম্ভব। যে-টুকু সম্ভব হবে তা মূল সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।

তাত্ত্বিক দিক থেকে একথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় নম্বরের মাপকাঠি দিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন অপরিহার্য, এর কোনো বিকল্প নেই। মূল সমস্যা হচ্ছে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরকে মূল্যায়নের প্রশ্নে শেষ কথা বলে যে-বিশ্বাস আমাদের মধ্যে শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছে তাকে উৎপাটন করা। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবককুলের মধ্যে নম্বরের প্রতি মোহ দ্রুত বেড়ে চলেছে। এখনকার সমাজ আমাদের ওপর যে তীব্র ও তিক্ত প্রতিযোগিতা চাপিয়ে দিয়েছে এবং দিয়ে চলেছে, তাতে পরীক্ষার নম্বর হয়ে উঠেছে 'জীবনের ধ্রুবতারা'। এই রাহুগ্রাস থেকে মানুষকে মুক্ত করার পথ কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না। এর উৎস অন্যত্র। তাই ফল প্রকাশের সময় বিভাগ (ডিভিশন)-এর পরিবর্তে 'গ্রেড' প্রবর্তন করলেই এই ক্রমবর্ধমান মূঢ়তাকে ঠেকানো যাবে এমন আশার কোনো ভিত্তি আছে কিনা তা সন্দেহের বিষয়।

সংসদের ব্যবস্থা ঃ—আমাদের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সম্প্রতি যে নতুন ব্যবস্থা চালু করলেন তার মর্মবস্তু এই রকম—

(ক) আগের মতই উত্তরপত্রের মূল্যায়ন নম্বর দিয়েই হবে। পরীক্ষকদের ব্যক্তিগত ঝোঁককে দূর করার জন্য কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হবে না।

(খ) পরীক্ষার বিষয়গুচ্ছ এবং উত্তীর্ণ হবার জন্য ন্যূনতম 'নম্বর' যা আছে তা-ই থাকবে।

(গ) মূল্যায়ন পত্রে (মার্কশীট) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর প্রত্যেকটি বিষয়ে বা পত্রে প্রাপ্ত নম্বর দেখানো হবে এবং তার পাশে নির্দিষ্ট সূত্রানুযায়ী তার বর্গ (গ্রেড) ইংরাজি বর্ণমালার অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা থাকবে। যথা—A+, A, B, C, D। সংসদ মনে করেন স্বতন্ত্রভাবে প্রতি পত্রে পরীক্ষার্থীর ব্যুৎপত্তির মান চিহ্নিত করে দেওয়া বেশী বিজ্ঞানসম্মত।

(ঘ) বিষয়সমূহে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মোট নম্বর দেখানো বা তার ভিত্তিতে সামগ্রিক সাফল্যের মান নির্দেশ করা হবে না।

মন্তব্য ঃ

১। আগেই বলা হয়েছে, পরীক্ষকদের দেওয়া নম্বরের মধ্যে সাযুজ্য বিধান করে তার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলার প্রয়াস এখানে নেই। শুধু সফল পরীক্ষার্থীদের শ্রেণিবিন্যাসের ধরণটি পাল্টানো হয়েছে। স্পষ্টতই নামে গ্রেডিং হলেও সেই প্রথার মূল উদ্দেশ্যকে স্পর্শ করা হয়নি।

২। সামগ্রিক ফলকে গণ্য না করে শুধু বিষয়ভিত্তিক গ্রেড উল্লেখ করার যুক্তিটি বিচার সাপেক্ষ। চরিত্র বিচারে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সাধারণ ও উচ্চশিক্ষার মধ্যবর্তী স্তর। এখানে প্রাথমিকভাবে বিষয় বিশেষায়ণের সূত্রপাত করা হয় প্রধানত শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও যোগ্যতা যাচাই করার সুযোগদানের উদ্দেশ্যে, যা তাদের স্নাতক স্তরে বিষয় নির্বাচনে সাহায্য করবে। এই পর্যায়ে অধীত সবকটি বিষয় এবং তাদের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের সামগ্রিক ব্যুৎপত্তি উপেক্ষণীয় নয়। সুতরাং সব পত্র মিলিয়ে মোট নম্বরের এবং বিভাগ বিন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। স্বতন্ত্রভাবে সাফল্যের মান নির্দেশ করার জন্য তো নম্বর দেওয়াই হচ্ছে যা অনেক বেশি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। যে ৪৫ নম্বর পেয়েছে তাকে 'B' তকমা দিয়ে চেনা এবং যে ১ নম্বর কম পেল তাকে 'C'-এর দলে ফেলা কি খুব অর্থবহ হবে?

৩। বিষয়ভিত্তিক গ্রেড নির্ধারণের যুক্তিটি কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে। সকলেই জানেন যে সাহিত্য, দর্শন জাতীয় বিষয়ে পাওয়া নম্বরের সঙ্গে বিজ্ঞান বা গণিতের নম্বরের তুলনা করা অবাস্তব। ইংরাজি সাহিত্যে আর পদার্থবিদ্যায় ৫০ শতাংশ নম্বরের তাৎপর্য সমান নয়। বিজ্ঞানসম্মত গ্রেডিং হলে তা বুঝিয়ে দেবে মোট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো একজনের তুলনামূলক অবস্থান কোথায়। সে কি প্রথম ১০ শতাংশ বা ২০ শতাংশ-এর মধ্যে আছে, না নীচের ধাপের ২৫ শতাংশের দলে পড়েছে। যে গাণিতিক প্রক্রিয়া ব্যতীত এই হিসেব করা সম্ভব নয় তা আমাদের আয়ত্তের বাইরে। সুতরাং সংসদের ব্যবস্থায় চরিত্র নির্বিশেষে বিষয় ও গ্রেড-এর মধ্যে সম্পর্ক অভিন্ন। গণিতে ৫৯ পেলেও Good, দর্শনেও তার চেয়ে উঁচু নয়। সুতরাং এই ব্যবস্থায় বিষয়ভিত্তিক গ্রেড উল্লেখের যাথার্থ প্রশ্নাতীত নয়।

৪। আসলে সংসদ কর্তৃপক্ষের উদ্বেগের কারণ অন্য জায়গায়, যা সংসদের ব্যাখ্যা পত্রে বলা আছে। প্রচলিত পাঠক্রম অনুসারে প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রীকে দু'টি ভাষা এবং তিনটি আবশ্যিক নির্বাচিত (Compulsory Elective Subject) বিষয় অধ্যয়ন করতে হয়। অবশ্য যারা চাইবে তাদের জন্য আরো একটি ঐচ্ছিক নির্বাচিত (Optional Elective Subject) বিষয় বেছে নেবার বিধানও আছে। শিক্ষার্থীরা সাধারণত মোট নম্বর বাড়িয়ে ফল ভাল করার লক্ষ্যেই এই অতিরিক্ত বিষয় পড়ে। এই চতুর্থ নির্বাচিত বিষয়ে পাশ করা বাধ্যতামূলক নয়। এবং এই বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৩০ শতাংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট নম্বর যোগ করা হয়। (বোঝা কঠিন নয় যে এটি পুরনো আমলের ইন্টারমিডিয়েট ব্যবস্থার অবিকল প্রতিরূপ) সুতরাং এই ব্যবস্থায় একই পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ মোট ১০০০ নম্বরের এবং অন্যেরা ১২০০ নম্বরের পরীক্ষা দেয়। অধুনা বিভাজিত ব্যবস্থায় দুই পর্বে ৫০০ এবং ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হবে। কিন্তু ফল নির্ধাণের সময় সব পরীক্ষার্থীর মোট নম্বর ১০০০ (৫০০) বলে গণ্য করা হবে। এমত অবস্থায় এই সম্ভাবনা থেকে যায় যে, কোনো পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর নির্ধারিত মোট নম্বরের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াবার তাগিদেই মূল্যায়ন পত্রে মোট প্রাপ্ত নম্বর না দেখানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে—এই ব্যবস্থা কি ঐ সমস্যার সমাধান করবে? সংসদ মোট প্রদত্ত নম্বর লিখে না দিলেও এই সরল যোগ অঙ্কটি তো সকলেই করে নেবেন। মোট নম্বরের ক্ষেত্রে ঐ আশঙ্কিত অসঙ্গতি থাকলে সেটা তো স্পষ্টতই দৃশ্যমান হবে।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য অন্য দুটি বিকল্প প্রস্তাব রাখা হচ্ছে বিবেচনার জন্য—

১। একটি অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয়ের সুবিধা (বা বোঝা) না রেখে সব পরীক্ষার্থীর অভিন্ন মান-এর (১০০০ বা ৫০০) পরীক্ষা নেওয়া।

২। যদি একই পরীক্ষায় দু'রকম পূর্ণমান বজায় থাকে, তবে দু'রকম মূল্যায়ন পত্র ও তদনুযায়ী শংসাপত্র প্রদানও অযৌক্তিক হবে না। সেইভাবে ১০০০ বা ৫০০ নম্বরের এবং ১২০০ বা ৬০০ নম্বরের পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হিসেব স্বতন্ত্রভাবে দেখানো যাবে। স্নাতক স্তরের পরীক্ষায় সাধারণ ও সাম্মানিক শাখার জন্য এমন ব্যবস্থাই তো চালু আছে।

চলে গেলেন অলৌকিক ভোরের কবি শামসুর রাহমান

আমাদের ভাষা আন্দোলনের ঋত্বিক কবি শামসুর রাহমান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর অনিবার্যতা স্বীকার করেও বলতে হয় 'মৃত্যু' তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। যে জীবন লগ্ন থাকে সৃষ্টিশীলতায়, দায়বদ্ধ উচ্চারণে—সে জীবন অনিঃশেষ।

কবি শামসুর রাহমানের জন্ম বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মাহুতটুলিতে ২৪ অক্টোবর ১৯২৯। পিতা আলহাজ্জ মুখলেসুর রাহমান চৌধুরী, মাতা মোসাম্মত আমেনী বেগম। এগারো ভাই-বোনের মধ্যে শামসুর চতুর্থ। ১৯৪৫-এ ষোলো বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলেও পাঠ অসমাপ্ত থাকে।

শামসুর পেশায় সাংবাদিক। অবশ্য সাহিত্যসাধনা ছিল তাঁর নেশা। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং নিউজ'-এ। ১৯৬৪ পর্যন্ত 'মর্নিং নিউজ'-এ সাব-এডিটরের পদে কাজ করেন। তার পর যোগ দেন বিখ্যাত বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তান'-এ, পরে যার নাম হয় 'দৈনিক বাংলা'। এই পত্রিকায় প্রথমে সহ-সম্পাদক পরে সম্পাদক হন।

সাংবাদিকতার পাশপাশি চলে শামসুরের সাহিত্যসাধনা। কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, শিশু ও কিশোর সাহিত্যে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেও তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। বাংলা ভাষা ও বঙ্গভূমির প্রতি তাঁর সহজাত টান। বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা তাঁর সত্তায় মিলেমিশে একাকার। তিনি ওপার ও এপার বাংলার জনপ্রিয় কবি। দুই বাংলার সাহিত্যসংস্কৃতির মেলবন্ধনে শামসুর অনলস কর্মী। 'প্রথম গান', 'দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'বিধ্বস্ত নীলিমা', 'নিজ বাসভূমে', 'বন্দিশিবির থেকে', 'দু-সময়ের মুখোমুখি', 'ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা', 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে', 'কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি', 'এক ফোঁটা কেমন অনল' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

কবি স্বদেশে ও বিদেশে বহু সম্মানে ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য পুরস্কার হল 'আদমজি পুরস্কার', 'বাংলা আকাদেমি পুরস্কার', 'জীবনানন্দ পুরস্কার', জাপানের 'মিতসুবিসি পুরস্কার' ইত্যাদি। শামসুর চলে গেলেও, আছে তাঁর অসংখ্য কালজয়ী সৃষ্টি। সেই সৃষ্টির মধ্যেই আমরা তাঁকে নিবিড়ভাবে পাবো, সবাই আন্তরিক হয়ে উঠবো—মানবতার প্রসারে।

নিঃশেষিত প্রতিভা বসু

প্রতিভা বসুর দেহাবসান হ'ল ১৩ অক্টোবর, ২০০৬ ভোরবেলায়। একটি যুগের অবসান ঘটল। ১৯১৫-২০০৬ প্রায় শতাব্দী-প্রাচীন জীবনের অভিজ্ঞতা তো কম নয়! সমাজজীবন-রাষ্ট্রীয়জীবনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত, পরিবর্তন তাঁর সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব বসুর মতো সৃষ্টিশীল মনীষার পাশাপাশি থেকেও নিজ প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল ছিলেন তিনি।

অতুলনীয় কণ্ঠ ও গায়কীর অধিকারিনী কিশোরী প্রতিভা সোম রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দিলীপ রায়ের কাছে গান শেখার দুর্লভ সৌভাগ্যলাভে ধন্য হয়েছিলেন। কিশোরী মেয়েটির মধ্যে অনেকেই আগামীদিনের প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীত শিল্পীকে খুঁজে পেয়েছিলেন। দেশ ভাগের পর প্রতিভা ঢাকা থেকে এপার বাংলায় এলেন। পরিচয় হল আর এক বিরল প্রতিভা বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে। পরিচয় থেকে প্রেম, প্রেম পূর্ণতা পেল পরিণয়ে। এই পরিণয়ের মূলে ছিল সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা। গায়িকা প্রতিভা সোম হারিয়ে গেলেন। জন্ম হল সাহিত্যসৃষ্টিতে মগ্ন প্রতিভা বসুর। এ সম্পর্কে বাণী বসুর বিশ্লেষণ ঃ

''দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাছাকাছি সময়ের আন্দোলনমুখর, সমস্যাজর্জর কলকাতার ঘূর্ণাবর্ত, অর্থকষ্ট, প্রিয়জনদের ভাগ্যবিপর্যয় এবং তার মধ্য দিয়েই গার্হস্থ্য ও সাহিত্য সাধনা—একধরণের অনুপম যাত্রা। হালটি ধরা ছিল তাঁরই হাতে। বিশ শতকের উত্তর-রবি যুগের প্রবল আধুনিক সাহিত্যোচ্ছ্বাসের জোয়ার-ভাটার কেন্দ্রে জীবন কাটিয়েছেন ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের কবিতা ভবনে। একদিন যিনি গান উপলক্ষে গত যুগের মহাজনদের স্নেহধন্য হয়েছিলেন, এখন সামনে তৈরী হয়ে উঠতে দেখলেন এ যুগের কবি-লেখকদের। অব্যবহিত আগের কল্লোল, কালি কলম ও এখনকার কবিতা-পত্রিকায়, কবিতাভবনের আড্ডায়, আলোচনায়। ..... প্রথম উপন্যাস 'মনোলীনা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪-এ। তারপর বহু উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন—'মনের ময়ূর', 'মধ্যরাতের তারা', 'আলো আমার আলো', 'পথে হল দেরী', 'উজ্জ্বল উদ্ধার', 'আশ্রিতা', 'সমুদ্র-হৃদয়'—এগুলির প্রায় সবই চলচ্চিত্র হয়েছে। ১৯৭৮-এ আনন্দ পুরস্কার পান। তাঁর গল্পগুলি ইচ্ছাপুরণেরই, কিন্তু যত দিন গেছে যুদ্ধ এবং দেশভাগের নির্মম, কঠিন বাস্তবের ইঁট গেঁথে গেঁথে রোমান্সের পটভূমি রচনা করেছেন।

বারবার বার্টল্যাণ্ডের সঙ্গে শার্লট ব্রনটির মিলমিশ যেন তাঁর লেখায়। তাঁর স্বাক্ষর রোম্যান্টিকতা। ঘরকন্না, নারীশোষণ, ফ্যামিলি পলিটিকস নয়। প্রেম এবং মোটেই লেস দেওয়া গলাবন্ধ লম্বাহাতা ব্লাউজ, শাড়ি চাদরে ঢাকাঢুকি প্রেম নয়। 'কাঁচা রোদ'-এর কলেজি রোমান্স 'মাধবীর জন্য'র জটিল গুপ্তঘাত। অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। বলতে কি বসু পরিবারে তাঁর মাধ্যমেই লক্ষ্মীর আগমন। মাঝবয়স থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত যে তিনটি বই লিখলেন, তা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের। ভ্রমণভিত্তিক জীবনকথা 'স্মৃতি সততই সুখের', আত্মজীবনী 'জীবনের জলছবি' এবং গবেষণা ধর্মী 'মহাভারতের মহারণ্যে'। যে কোনও লেখাতেই স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা তাঁর প্রধান গুণ। জীবনীতে তিনি খোলামেলা অকপট, অন্তরঙ্গতায় যেন পাঠককে পরিবারভুক্ত করে নেন। খোলাখুলি বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অসহযোগিতা, সাহিত্যজগতের হিংসা-দ্বেষ-অন্তর্ঘাতের পলিটিকস-এর কথা। 'জীবনের জলছবি' শুধু তাঁর আত্মজীবনী নয়, তখনকার উঠতি সাহিত্য-সংসারের এক জ্বলজ্বলে ছবি। এখন যাঁদের নাম পাঠকদের মুখে মুখে, তাঁদের অনেককেই এখানে অন্তরঙ্গ স্কেচে পাই।'' যতদিন বাংলা-সাহিত্য থাকবে ততদিন নিঃশেষিত প্রতিভার উৎস রূপে তিনি আমাদের মধ্যে থাকবেন।

মাধ্যমিকে গ্রেডিং ঃ পরিক্রমা ও প্রস্তাবনা

উজ্জ্বল বসু

শেখা-শেখানোর পরীক্ষার অন্তর্সম্পর্ক ঃ

পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার বিষয়ে সারাদেশে এখন আলোচনা চলছে। পাশাপাশি চলছে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ। পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় শিক্ষাকার্যক্রম। শ্রেণিকক্ষে লেখাপড়ার মাধ্যমে বোঝা যায় পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যবস্তুগুলি কতখানি শেখা ও শেখানোকে সম্ভবপর করে তুলেছে। পরীক্ষা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে শেখা ও শেখানোর কার্যকারিতা আরো পরিষ্কার হয়। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ ঃ

১। পাঠক্রমের পাঠ্যবস্তুগত উপাদানগুলিকে শেখা-শেখানোর প্রেক্ষায় জ্ঞান (তথ্য), বোধ (ধারণা), প্রয়োগ ও দক্ষতার নিরিখে এককে এবং উপ-এককে বিশ্লেষণ করে প্রকৃতপক্ষে কতটা শিখন সামর্থ্য পড়ুয়া অর্জন করেছে তার আন্দাজ পাওয়া এবং শিখন দুর্বলতা বা শিখন ঘাটতির বিষয়ে ধারণা করা।

২। শিখন দুর্বলতা বা ঘাটতি দূর করার জন্য সংশোধনী পাঠ এবং অগ্রসর সাথী পড়ুয়ার সাহায্যে ভ্রম শুদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ। মাধ্যমিকের মতো শিক্ষাক্রমের মেয়াদ যেহেতু সুদীর্ঘ এবং তা ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক, বৌদ্ধিক ও চেতনার উন্মেষকাল, সে কারণে লেখাপড়া ও পরীক্ষার প্রশ্নে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা খুবই প্রাসঙ্গিক। মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে হুট করে একটা কিছু করে ফেলা মোটেই সঙ্গত নয়। সাতপাঁচ ভেবে নিয়েই এগোনো দরকার।

সাতপাঁচ ভাবনা ঃ

শেখা-শেখানো নিয়ে গত তিন দশকে প্রচুর ভাবনা হয়েছে। হয়েছে বেশকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও। সবেরই মূলে ছিল কীভাবে শেখা-শেখানোয় আনা যায় নতুন নতুন পদ্ধতি-প্রকরণ। হয়তো পাহাড়প্রমাণ প্রকরণের ভারে 'সহজ শিক্ষা' হারিয়ে যেতে বসেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষার বিধান হয়। প্রণালী প্রকরণের দ্বারা কিছু ঘাটতি পূরণ হতে পারে। কাছ থেকে দূরে যাওয়া, চেনা থেকে অচেনায়—এই ছিল শিক্ষা-স্থাপত্যের অগ্রসুরী রবীন্দ্রনাথের সহজ শিক্ষার বিষয়ে পরামর্শ।

কী করলে জানাটা পোক্ত হয়, বোধ সুগঠিত হতে পারে, প্রয়োগ-দক্ষতা বেড়ে ওঠে, সে সবের কৃৎকৌশল নিয়ে অনেক চর্চা আমরা গত তিন দশকে করেছি। চর্চাটা মজ্জাগত হয়ে ওঠেনি। কেন না, তাতে মার্কা যুক্ত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ একবার সখেদে বলেছিলেন, যাহাতে মার্কা নাই, তাহার কদরও নাই।

মার্কার রকমফের ঃ

স্কুলের পরীক্ষার মার্কা আর মাধ্যমিকের স্তর প্রান্তিক পরীক্ষার মার্কা ব্যবস্থা—এ দুয়ের সম্পর্ক কী, উদ্দেশ্যই বা কী, সেই ধারণাটা সবার আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির, এমন কি নবম শ্রেণির পড়াশোনায় লক্ষ্যটা হলো ভুলভ্রান্তি, দুর্বলতা, ফাঁকফোকর দূর করে যা শেখার তা পাকাপোক্তভাবে শিখে ফেলা, অর্থাৎ কাম্য শিখন-সামর্থ্য অর্জন করা। আর অভীপ্সিত সামর্থ্যগুলি পড়ুয়াদের অধিগত হলো কিনা তা পরীক্ষার সাহায্যে পরিমাপ করা। পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে যে দুর্বলতা ধরা পড়লো, সেগুলি দূর করার জন্য সংশোধনী পাঠের আয়োজন করা।

আর মাধ্যমিক পরীক্ষা বা স্তর-প্রান্তিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের মার্কা প্রদান করে তাদের সাফল্যের গোত্র-বিচারই উদ্দেশ্য। এই বিচারটি করা হয় নম্বর প্রদানের ভিত্তিতে। প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ, তৃতীয় বিভাগ, স্টার ইত্যাদি হলো মার্কার গ্রেডিং বা স্তর বিন্যাস। নম্বর-গ্রেডিং, আখ্যা বা বিশ্লেষণাত্মক গ্রেডিং ইত্যাদি নানা গ্রেডিং আছে। আবার, এ তিনের সমন্বিত অবস্থানও আছে। আসলে সবেরই লক্ষ্য হলো পড়ুয়াদের অগ্রগতির পরিমাপ।

নম্বর গ্রেডিংয়ের সীমাবদ্ধতাটা প্রথমে বুঝে নেওয়া দরকার

নম্বর প্রদানের ঘোরপ্যাঁচ ঃ

প্রচলিত নম্বর গ্রেডিংয়ের প্রধান অসুবিধে হলো এর সুবিস্তৃত ১০১ পয়েন্টের পরিমাপক যে স্কেলটি ঃ ০-১০০ পয়েন্ট। কারুর গোল্লা পাওয়ার অর্থ তার সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা নয়। আবার ১০০ পাওয়ার মানে এই নয় যে, বাস্তবত শতকরা ১০০ ভাগ জ্ঞানই তার অধিগত। ১০১ পয়েন্টের মত সুবিশাল পরিমাপকে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের তুলনাও বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। পরীক্ষক ভেদে (ইণ্টার এগজামিনার) এবং বিভিন্ন সময়ে একই পরীক্ষকের (ইন্ট্রা এগজামিনার) পরিমাপনের যে তারতম্য ঘটে থাকে তাতে নম্বর গ্রেডিংয়ের যাথার্থতা নিয়েই প্রশ্ন জেগে যায়। পরীক্ষক-বিশেষের মানসিক অবস্থার তারতম্যেও সুবিশাল ১০১ পয়েন্টের পরিমাপকে অর্জিত সামর্থ্যের নিখুঁত

মূল্যাংকনে পৌছানো বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে সাফল্য-গুচ্ছ, 'এবিলিটি ব্যাণ্ডস'-এর দ্বারা ছোট ছোট বিস্তারের নম্বরকে (রেঞ্জ অব স্কোরস) সাফল্য সূচক হিসাবে গ্রাহ্য করা যেতে পারে। সেগুলিই হলো অর্জিত সামর্থ্যের মান-নির্ণায়ক বা 'গ্রেডস'। নম্বরের ঘোরপ্যাঁচ থেকে বেরিয়ে আসার পথ। নম্বর প্রদান পদ্ধতির সব ধরণের জটিলতার মুশকিল আসান গ্রেডিং পদ্ধতি একথা অবশ্যই জোর দিয়ে বলা যায় না।

গ্রেডিংয়ের স্বরূপ ঃ

পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রকে নম্বর স্কেলে মূল্যায়ন করার পর বিভিন্ন অক্ষর-মানে তাদের প্রাপ্ত ফলকে চিহ্নিত করার পদ্ধতি হলো গ্রেডিং। পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত ফলটি উদ্দেশ্য-সাধক পাঠক্রমের ওপর অর্জিত দক্ষতার প্রতিফলনের নির্দেশক। গ্রেডিংয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন অক্ষর-গ্রেড বা লেটার-গ্রেডগুলি এক পারম্পর্য সূত্রে বাঁধা থাকে। নম্বরও হলো এক ধরণের গ্রেড। আন্তর্জাতিক স্তরে নম্বর-গ্রেডের স্বীকৃত পরিমাপক বা স্কেলটি হলো ১০১ পয়েন্টের। কিন্তু ভারতে নম্বর-গ্রেডের এই সুবিশাল পরিমাপকটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো কৃতি-সূচক (পারফরমেন্স ডেসক্রিপটর) লেটার গ্রেডের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। নম্বর বসিয়ে পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের পরিমাপ (কোয়ানটিটেটিভ) সম্ভব, কিন্তু পরীক্ষার্থীর গুণগত (কোয়ালিটেটিভ) মূল্যায়ন সম্ভব নয়। সেটি সম্ভব গ্রেডে। নম্বরকে লেটার গ্রেডে রূপান্তর (ট্রান্সফর্ম) করলেই তা বিশেষ সূচক বা নির্দেশকের কাজ করে। সেই নির্দেশক কৃতি-সূচক বা পারফরমেন্স ডেসক্রিপটরে (যেমন—এক্সসেলেণ্ট বা চমকপ্রদ, ভালো, মাঝারি, দুর্বল) ফেললে তবেই মূল্যায়ন বা ইভ্যালুয়েশন সম্ভবপর হয়।

গ্রেড হলো গুণগত মান-নির্ণায়ক (কোয়ালিটেটিভ এ্যাসেসমেণ্ট) পদ্ধতি। প্রতিটি গ্রেড পরীক্ষার্থীর অগ্রগতি বা কৃতিত্বের (প্রগ্রেস বা অ্যাচিভমেণ্ট) সূচক বিশ্বের নানা দেশে নম্বর পরিমাপকের পাশাপাশি লেটার গ্রেড এবং কৃতি-সূচক (পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টর) প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর গুণগত মান ও উন্নয়ন-অবনমনের ধারণা পাওয়া যায়। বলা যায়, এই সূচকগুলি সহজ ইঙ্গিতবাহী।

গ্রেডের প্রয়োজন কোথায় ঃ

একটা অভিমত হলো নম্বর-পদ্ধতি পরীক্ষার্থীদের, বিশেষ করে যারা কম নম্বর পায়, তাদের মানসিক চাপ বাড়িয়ে দেয়। নম্বর-পদ্ধতি চালু থাকা ঠিক নয়। দেশ-বিদেশের গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রেড-পদ্ধতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের কৃতিত্ব, অগ্রগতি, দুর্বলতা, ইত্যাদি বুঝতে ভালোমতো সাহায্য করে। ছাত্র-ছাত্রীর জ্ঞান রপ্ত করার সামর্থ্যের কার্যকর পরিমাপক হিসাবে গ্রেড দেশে-বিদেশে বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও গ্রেডের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীর গুণগত অবস্থান বা স্টেটাস সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন। গ্রেডের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝোঁক বা ট্যালেণ্ট বোঝা সম্ভব এবং তাদের বৃত্তি নির্বাচনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা কাউন্সেলিংও করা সহজ হয়। পিতামাতা, অভিভাবকরাও গ্রেডের মাধ্যমে তাদের সন্ততিদের পড়াশোনার সঠিক অবস্থানটি বুঝে নিতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। গ্রেডের মাধ্যমে পড়ুয়ারাও নিজেদের সবলতা-দুর্বলতার আন্দাজ পেতে পারে। এক কথায়, গ্রেড ছাত্র-ছাত্রীদের শেখায় উৎসাহিত করে। ছাত্রভেদে শেখানোর মানচিত্র রচনায় শিক্ষকদের সঠিক ইঙ্গিত যোগায়।

গ্রেডিংয়ের সুবিধা কোথায় ঃ

গ্রেডিংয়ের প্রধান সুবিধা তিনটি ঃ

(এক) পড়ুয়ার নিজস্ব শেখার ক্ষমতা, উদ্যোগে (স্টুডেন্ট লার্নিং) উৎসাহ যোগায়,

(দুই) পড়ুয়া-শিক্ষক সম্পর্ককে অধিকতর সংবেদী-সংবাহী করে তোলে (সেনসিটিভ-কমিউনিকেটিভ),

(তিন) শেখা-শেখানোয় গুণগত উৎকর্ষের অভিমুখ তীক্ষ্ণতর হয়।

প্রথম সুবিধাটির সূত্রে বলা যায়, পড়ুয়ারা শেখা ও উত্তরদানের কলাকৌশলে এবং নিজেদের খসড়া উত্তরগুলিকে ঘষা-মাজার বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হয়ে ওঠে। কেন-না, গ্রেড বিষয়ে সচেতনতার ফলে উন্নততর গ্রেডে পৌছবার স্পৃহা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। এসবের ফলে স্বশিখন, সাথী-পড়ুয়ার সাহায্যে শিখন (পিয়ার লার্নিং) এবং শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের (ইন্টারোকটিভিটি) কার্যকরী বাতাবরণ তৈরী হয়।

গ্রেডিং পদ্ধতিতে একাধিক পরীক্ষার মিলিত ফলাফলের (কিউমুলেটিভ গ্রেডিং) ওপর গুরুত্ব থাকায় এক পরীক্ষার অমোঘতাজনিত হতাশা-বিষণ্ণতা-মানসিক চাপ থেকে পড়ুয়ারা মুক্ত থাকতে পারে বলে উন্নততর গ্রেডে পৌছবার স্পৃহাও তাদের মধ্যে অব্যাহত থাকে। নিজেদের তৈরি পূর্বের উত্তরগুলির চেয়ে পরের উত্তরগুলি গুণগত মানোন্নয়নে তাদের মধ্যে লেখাপড়ার নবতর উদ্যম তৈরী হয়।

দ্বিতীয় সুবিধাটির সূত্রে বলা যায়, তাদের লেখা উত্তরগুলির বিষয়ে শিক্ষক-পরীক্ষকদের কাছ থেকে অধিকতর প্রতিপুষ্টি (ফিডব্যাক) পড়ুয়ারা পেতে পারে। এতে উত্তর প্রদানের লক্ষ্যগুলিও তাদের কাছে শিক্ষকদের প্রত্যাশার বিষয়ে তাদের ধারণাও স্বচ্ছ হয়।

তৃতীয় সুবিধাটির ক্ষেত্রে ছোটো করে বলতে গেলে, পড়ুয়াদের ক্রমোন্নতির নির্দেশকগুলি (ডেভালপমেণ্ট বেঞ্চমার্কস) গ্রেডিং ব্যবস্থায় সুস্পষ্ট থাকায় শিখন-শিক্ষণের গুণগত উৎকর্ষের যাত্রাপথটি আলোকিত হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীর দেওয়া লিখিত উত্তরগুলিকে নির্দিষ্ট কৃতি-সূচক বা পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টরে

ফেলার কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকারা অভ্যস্ত হয়ে উঠলে মূল্যায়ন ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষাকার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সম্পর্ক (কোর্স অবজেকটিভস) বোঝার ক্ষেত্রগুলিও স্পষ্ট হয়।

পড়ুয়ারা কেমন শিখছে গ্রেড পদ্ধতিতে সেটা সুস্পষ্ট হয় ঃ

১. উত্তরের উৎকর্ষ চিহ্নিতকরণে পড়ুয়ারা দক্ষ হয়ে ওঠে।
২. ভালো উত্তর সংগঠনে পড়ুয়ারা অনুপ্রাণিত হয়।
৩. পড়ুয়াদের লেখাপড়ার অগ্রগতির বিষয়ে শিক্ষকদের অভিমত স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।
৪. পড়ুয়াদের শেখা ও না-শেখার ক্ষেত্রগুলি শিক্ষকদের কাছ থেকে ধরা পড়ে। (পাঠক্রমের একক-উপএকক ভিত্তিক বিভাজনের সুবাদে)
৫. শিক্ষার পরবর্তী স্তরগুলির জন্য পড়ুয়া-নির্বাচন সহজ হয়।

গ্রেড প্রদান পদ্ধতি গৃহীত ও প্রযুক্ত হলেও দেখতে হবে যে গ্রেডিংয়ের ওপর যেন অতিরিক্ত জোর না পড়ে (ওভার এমফ্যাসিস)। নিঃসন্দেহে ভালো মানের গ্রেড পেলে পড়ুয়ারা বেশি শেখায় আগ্রহী হয়। কিন্তু পাশাপাশি তাদের এ কথাটাও মনে রাখা দরকার যে ভালো গ্রেড পাওয়াটা শিক্ষার লক্ষ্য নয়। শিক্ষার লক্ষ্য হলো জ্ঞানার্জন। ভালো গ্রেড পাওয়াটা যেমন জরুরী, তেমনি খারাপ গ্রেডকে ঠাণ্ডা মাথায় মেনে নিয়ে আরো ভালো গ্রেডের দিকে এগিয়ে যাওয়াটাও জরুরী।

গ্রেড ব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রণালী ছাত্রদের বুঝিয়ে বলা দরকার। এগুলো বোঝানো হয়ে গেলে গ্রেডের ওপর গুরুত্ব আরোপের বিষয়টি এড়িয়ে চলা দরকার। না হলে উঁচু নম্বর পাওয়ার জন্য যে মানসিক চাপ তৈরী হয়, ভালো গ্রেড পাওয়ার জন্যও সেরকম চাপ পড়ুয়াদের অস্থির করে তুলতে পারে। ফলে পড়ুয়ার লেখাপড়ার অগ্রগতির পরিমাপক হিসেবে গ্রেডের ভূমিকাটি নজরের বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়।

গ্রেড পদ্ধতির যাচাই কৌশল (এ্যাসেসমেন্ট) বৈচিত্র ঃ

সারা বিশ্বের পরীক্ষাব্যবস্থায় গ্রেড পদ্ধতির নানা রকমফের (রেঞ্জ অফ ভ্যারাইটি) পরিলক্ষিত হয়। বিস্তর বিষয়ের পরীক্ষার ও নানা ধরণের কর্ম-প্রকল্পের (এ্যাকটিভিটি) মূল্যায়নে এইসব গ্রেড পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেসব ক্ষেত্রে নানাস্তরের কর্মকৃতির (পারফরমেন্স) সম্ভাবনা থাকে সেখানেই গ্রেড পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। এইসব ক্ষেত্রে নানা কৃতিসূচক (পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টর) ব্যবহার হয়। যেমন, চমৎকার (এক্সসেলেন্ট), বেশ ভালো (ভেরি গুড), মাঝারি মানের (এ্যাভারেজ), তত ভালো নয় (নট সো গুড) ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে নম্বর গ্রেডেরও ব্যবহার দেখা যায়, যথা—১,২,৩,৪,৫ ইত্যাদি। এককথায়, গ্রেডিং হলো ব্যক্তিক প্রয়াসকে (সাবজেকটিভ টাস্ক) নৈর্ব্যক্তিক এবং সুসমঞ্জস্য (অবজেকটিভ এ্যাণ্ড কনসিসটেন্ট) যাচাই-বিন্যাসের ছকে (এ্যাসেসমেন্ট প্যারাডিম) ফেলা।

গ্রেডিংয়ের আন্তর্জাতিক চালচিত্র ঃ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের (এন সি ই আর টি) অন্তর্গত ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশনাল মেজারমেণ্ট এ্যাণ্ড ইভ্যালুয়েশন ২০০৪ সালে 'গ্রেডিং-এর ইণ্টারন্যাশনাল পারস্পেকটিভ' নামে একটি সমীক্ষাপত্র (মনোগ্রাফ) প্রকাশ করে। মনোগ্রাফটিতে ২০০৩ সালের রাষ্ট্রসংঘের হিউম্যান ডেভালপমেণ্ট রিপোর্টের নিরিখে ১৬টি উন্নত এবং ২৫টি উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষাস্তরে অনুসৃত বিভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতির চিত্র তুলে ধরা হয়।

নীচের টেবিলগুলিতে (পরবর্তী পৃষ্ঠায়) সেই চিত্র সূত্রায়িত আকারে তুলে ধরা হলো ঃ

(১) ক্রমিক নং	(২) দেশের নাম	(৩) নম্বর স্কেল	(৪) লেটার গ্রেড	(৫) পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টর/পারসেনটাইল
১	আমেরিকা	৫ পয়েণ্ট	A,B,C,D,F	৫ স্তর বা লেভেল এক্সসেলেন্ট, গুড, এ্যাভারেজ/ফেয়ার, পুওর/পাস, ফেলিওর
২	কানাডা	১০১ পয়েণ্ট	ABC+C,C,-F	৬ স্তর ৮৬-১০০%, ৭৩-৮৫%, ৬৭-৭২%, ৬০-৬৬%, ৫০-৫৯%, ০-৪৯%
৩	অস্ট্রেলিয়া (উত্তরাঞ্চল)	২০ পয়েণ্ট	A,B,C,D,E অথবা A+,A,B,C,D,E	৫/৬ স্তর এক্সসেলেণ্ট আ্যাচিভমেণ্ট, হাই অ্যাচিভমেণ্ট, সাউণ্ড অ্যাচিভমেণ্ট লিমিটেড অ্যাচিভমেণ্ট, ইনএ্যাডিকোয়েট অ্যাচিভমেণ্ট অথবা আউটস্ট্যাণ্ডিং অ্যাচিভমেণ্ট এবং ওপরের পাঁচটি

(১) ক্রমিক নং	(২) দেশের নাম	(৩) নম্বর স্কেল	(৪) লেটার গ্রেড	(৫) পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্ট র/পারসেনটাইল
৪	সুইডেন	৩ পয়েন্ট	MVG,VG,G,IG	৪ স্তর
				পাস উইথ স্পেশাল ডিসটিংশন (ভ্যালু ঃ ৩ পয়েন্ট),
				স্পেশাল ডিসটিংশন (ভ্যালু ঃ ২ পয়েন্ট),
				পাস (ভ্যালু ঃ ১ পয়েন্ট),
				ফেল (ভ্যালু ঃ ০ পয়েন্ট),
৫	সুইজারল্যাণ্ড	১০ পয়েন্ট	—	৫ স্তর
				ভেরি গুড, গুড, ফেয়ার, পাস, পুওর/ফেল, ফেল
৬	জার্মানি	১৫ পয়েন্ট		
		১৫, ১৪, ১৩	A1, A2, A3	ভেরি গুড
		১২, ১১, ১০	B1, B2, B3	গুড
		৯, ৮, ৭	C1, C2, C3	স্যাটিসফ্যাকটরি
		৬, ৫, ৪	D1, D2, D3	পাস
		৩, ২, ১, ০		ফেল
৭	ফ্রান্স	২১ পয়েন্ট	—	৪ স্তর
		১৬-২০		এক্সসেলেন্ট
		১৪-১৫		ভেরি গুড
		১২-১৩		গুড
		১০-১১		স্যাটিসফ্যাকটরি
		১০-এর নিচে		ফেল
৮	স্পেন	১০ পয়েন্ট	—	৬ স্তর
		১০		ডিস্টিংশন উইথ অনার
		৮.৫-৯		ডিস্টিংশন
		৭-৮.৪		ভেরি গুড
		৬-৬.৯		গুড
		৫-৬		স্যাটিসফ্যাকটরি
		৫-এর নিচে		ফেল
৯	ইংলণ্ড (ও-লেভেল)	৬ পয়েন্ট	A,B,C,D,E, এবং E	৬ স্তর 80-100%, 70-79%, 60-69%, 50-59%, 40-49%, 30-39%
১০	পর্তুগাল	২১ পয়েন্ট/ ১০১ পয়েন্ট ২০,১৯,১৮,১৭ ১৬,১৫,১৪,১৩ ১২,১১,১০ (১০-এর নিচে যারা পায় তাদের কোন পয়েন্ট হয় না)	A1,A2: B1,B2,B3 C1,C2,C3:D1,D2,D3	১১টি স্তর (পয়েন্টভিত্তিক) 100.90.85.80.75 70.65.60.55.50.45

(১) ক্রমিক নং	(২) দেশের নাম	(৩) নম্বর স্কেল	(৪) লেটার গ্রেড	(৫) পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্ট র/পারসেনটাইল
১১	ডেনমার্ক	১০ পয়েন্ট/ ১০১ পয়েন্ট	—	—
১২	আইসল্যাণ্ড	৬ পয়েন্ট/ ১০১ পয়েন্ট	—	—
১৩	জাপান	৩ পয়েন্ট ৩, ২, ১	—	৩ স্তর হাইয়েস্ট গ্রেড, মিডিল গ্রেড, লোয়ার গ্রেড
১৪	নিউজিল্যাণ্ড	৯ পয়েন্ট/ ৫ পয়েন্ট	A, B, C, D, E	—
১৫	বেলজিয়াম	২০ পয়েন্ট	—	—
১৬	গ্রীস	১০ পয়েন্ট/ ২০ পয়েন্ট	A, B, C, D, E	৫ স্তর 17-20, 14-16.99, 12-13.99, 10-11.99, below 10:Fail
১৭	লিথুয়ানিয়া	৫ পয়েন্ট/ ১০ পয়েন্ট/ ১০১ পয়েন্ট	—	১০ স্তর
১৮	ইরান	২১ পয়েন্ট/ ১০১ পয়েন্ট	A, B, C, D	—
১৯	পেরু	২১ পয়েন্ট/ ১০১ পয়েন্ট	—	—
২০	রাশিয়া	৮ পয়েন্ট ৫,৪,৩,২	—	৪ স্তর এক্সসেলেন্ট, গুড, স্যাটিসফ্যাকটরি (পাস), আনস্যাটিসফ্যাকটরি (ফেল)
২১	পোল্যাণ্ড	৬ পয়েন্ট 1,2,3,4,5,6	—	৬ স্তর আনস্যাটিসফ্যাকটরি মিডিওকার স্যাটিসফ্যাকটরি, গুড, ভেরি গুড, এক্সসেলেন্ট
২২	টার্কি	৬ পয়েন্ট/ ১০ পয়েন্ট	A,B,C,D,E,F	—
২৩	ইন্দোনেশিয়া	১০ পয়েন্ট 1-4, 5,6,7,8 9,10	—	৭ স্তর ফেল, বিলো অ্যাভারেজ, অ্যাভারেজ, অ্যাবাভ অ্যাভারেজ, গুড, ভেরি গুড, এক্সসেলেন্ট
২৪	চীন	১০১ পয়েন্ট	A,B,C,D,F	৫ স্তর এক্সসেলেন্ট, গুড, অ্যাভারেজ, স্যাটিসফ্যাকটরি, আনস্যাটিসফ্যাকটরি (ফেল)
২৫	ব্রাজিল	১১ পয়েন্ট	A-D/E.B.C.I.M.S	৪-৬ স্তর
২৬	জামবিয়া	৯ পয়েন্ট	A-E	—
২৭	নাইজিরিয়া	৯ পয়েন্ট/ ৫ পয়েন্ট	A-F	৫ স্তর
২৮	সাউথ কোরিয়া	১০১ পয়েন্ট	A-E	৫ স্তর

(১) ক্রমিক নং	(২) দেশের নাম	(৩) নম্বর স্কেল	(৪) লেটার গ্রেড	(৫) পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টর/পারসেনটাইল
২৯	থাইল্যাণ্ড	৫ পয়েন্ট	—	৫ স্তর
৩০	সিঙ্গাপুর	১০১ পয়েন্ট/ ৯ পয়েন্ট/ ৫ পয়েন্ট	A1-F9/A-E	৫ স্তর
৩১	রোমানিয়া	১০ পয়েন্ট	—	—
৩২	ইয়েমেন	৫ পয়েন্ট	—	৫ স্তর
৩৩	জিম্বাবুয়ে	৫ পয়েন্ট/ ১০ পয়েন্ট	A-F	৬ স্তর / ৫ স্তর
৩৪	সাউথ আফ্রিকা	১০১ পয়েন্ট	A-F & H	—
৩৫	ইজিপ্ট	১০১ পয়েন্ট	—	৪ স্তর
৩৬	শ্রীলঙ্কা	১০১ পয়েন্ট	A,B,C,S & F	৫ স্তর
৩৭	পাকিস্তান	১০১ পয়েন্ট/ ৬ পয়েন্ঢ	A-F	৬ স্তর
৩৮	আর্জেন্টিনা	১০ পয়েন্ট/ ১১ পয়েন্ট	—	৬ স্তর
৩৯	বাংলাদেশ	১০১ পয়েন্ট	—	৪ স্তর
৪০	মালয়েশিয়া	৯ পয়েন্ট	A-F	৪ স্তর
৪১	ভারত	১০১ পয়েন্ট/ ৯ পয়েন্ট	A1-D2 & E C B S E	৫ স্তর Distinction/1st class/2nd class/Pass/Fail

নম্বর স্কেলের ধরণের ভিত্তিতে দেশগত অবস্থানের টেবিল

নম্বর স্কেল	দেশের সংখ্যা
৩ পয়েন্ট	২
৪ পয়েন্ট	১
৫ পয়েন্ট	৮
৬ পয়েন্ট	৫
৯ পয়েন্ট	৫
১০ পয়েন্ট	৮
১১ পয়েন্ট	২
১৫ পয়েন্ট	১
২০ পয়েন্ট	৩
২১ পয়েন্ট	৪
১০১ পয়েন্ট	১৮

কৃতি সূচক (পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টরের) ভিত্তিতে দেশগত অবস্থানের টেবিল

কৃতি সূচকের স্তর সংখ্যা	দেশের সংখ্যা
৩ স্তর বা লেভেল	১
৪ স্তর	৭
৫ স্তর	১৪
৬ স্তর	৮
৭ স্তর	১
১০ স্তর	১

পরিসংখ্যান থেকে যা পাওয়া গেল ঃ

১৬টি উন্নত দেশের মধ্যে ৪টি দেশ ১০১ পয়েন্ট স্কেল ব্যবহার করে। এরা হলো কানাডা, পর্তুগাল, ডেনমার্ক ও আইসল্যাণ্ড। তাও এরা ছোটো ছোটো নম্বর স্কেলের দিকে ঝুঁকছে।

২৪টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ১৩টি দেশ ১০১ পয়েন্ট স্কেল ব্যবহার করে। পাশাপাশি এরা ছোটো নম্বর স্কেল এবং পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টর বা কৃতিসূচকও ব্যবহার করে। একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট। কোনো দেশেই স্কেলের বিষয়ে কোন জাতীয় ফতোয়া (ন্যাশনাল ম্যানডেট) নেই। স্কুলগুলিকে গ্রেডের বিষয়ে সম্পূর্ণ অটোনমি দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার ঃ কিছু ভাবনা, কিছু প্রস্তাব

মূল্যায়নের দ্বিবিধ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হলো—

১. পাঠক্রম ও পাঠ্যবস্তুর অন্তর্গত জ্ঞান-বোধ-প্রয়োগ-দক্ষতা কেন্দ্রিক শিখন সামর্থের একক-উপএককগুলি পড়ুয়ারা কতোটা রপ্ত করেছে এবং কতোটাই বা তার আয়ত্বের বাইরে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট পরিমাপক বা স্কেলের সাহায্যে আন্দাজ পাওয়া। এই পরিমাপক বা স্কেলটি নম্বরের হতে পারে বা পয়েন্টের। কৃতিসূচকটি (পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টর) ৫ বা ৪ লেভেল স্তরের হতে পারে, আবার ১০-১১ স্তরেরও হতে পারে। একটা কোর্সের চূড়ান্ত পরীক্ষায় সাধারণত ৫ স্তরেরই হয়।

২. কিন্তু বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে যেহেতু মূল্যায়নটি পড়ুয়ার উন্নতিসাধক বা ডেভালপমেন্টাল, সে কারণে অনুপুঙ্খ সংশোধনী ব্যবস্থা বা রেমেডিয়াল মেজারস্-এর জন্য ১০-১১ স্তরের হলে বিশেষ সুবিধার হয়। সাথী-পড়ুয়ার সাহায্যে সংশোধন বা পিয়ার কারেকশনের কর্মসূচির ব্যবস্থাও জরুরী। এতে গ্রেড ডেভালপমেন্টে পড়ুয়াদের মধ্যে উৎসাহ বাড়বে। এসবের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য পড়ুয়া প্রস্তুতির কাজও (স্টুডেন্ট প্রিপারেশন) এগোবে।

বিদ্যালয়-অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ব্যবস্থা ও মাধ্যমিকের মূল্যায়ন ব্যবস্থার লক্ষ্য ভিন্নতর। বিদ্যালয়-অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন হলো উন্নতিসাধক বা ডেভালপমেন্টাল। শিখন সামর্থের দুর্বলতা চিহ্নিত করে সংশোধনীর ব্যবস্থা করা সুদীর্ঘ বিদ্যালয়কালীন পর্যায়ে (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম বা নবম শ্রেণি) একটা জরুরী কাজ।

মাধ্যমিকের মতো চূড়ান্ত পরীক্ষায় মূল্যায়ন হলো বিচার বিশেষ। যা শিখছে তার ভিত্তিতে মার্কা দিয়ে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে ভর্তি হওয়ার বা বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ গ্রহণের ছাড়পত্র দেওয়া।

সুতরাং, অষ্টম বা নবম শ্রেণি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ও সঠিক মূল্যায়নের (সি সি ই) ব্যবস্থা খুবই সঙ্গত। তাৎক্ষণিক (অর্থাৎ, ক্লাসে পড়ানোর সময়), এককভিত্তিক সাপ্তাহিক, পার্বিক, প্রান্তিক বা সিমেস্টার প্রভৃতির সমন্বয়ে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে পড়ুয়ার উন্নতির নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণই বিদ্যালয়-অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মূল কথা।

নিরবচ্ছিন্ন ও সঠিক মূল্যায়নের একটা পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা (হোলিস্টিক প্ল্যানিং) থাকা দরকার যেটি গ্রেডিং ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যের—পড়ুয়া প্রস্তুতি বা স্টুডেন্ট প্রিপারেশন—সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনাটিকে এইভাবে ভাবা যেতে পারে ঃ

১. প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিভিন্ন বিষয়ের পাঠক্রম বা পাঠ্যবস্তুকে পাঠদানের একক-উপএককে বিশ্লেষণ করবেন।

২. তারপর সেইসব একক-উপএককের বিষয়গত উপাদানকে জ্ঞান-বোধ-প্রয়োগ-দক্ষতা সহায়ক হিসাবে চিহ্নিতকরণ করবেন।

৩. এরপর, ক্লাস পিরিয়ডে এইসব একক এবং উপএককগুলিকে বিন্যস্ত করে একটি রুটিন তৈরী করবেন। এই রুটিনের সঙ্গে বর্ষব্যাপী একটি এ্যাকাডেমিক ক্যালেণ্ডার তৈরী করবেন। রুটিন ও এ্যাকাডেমিক ক্যালেণ্ডার বছরের প্রারম্ভে ছাত্র-ছাত্রীদের জানিয়ে দিতে হবে। রুটিন ও ক্যালেণ্ডারে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট পিরিয়ড ও দিন চিহ্নিত করা থাকবে।

গ্রেডিংয়ের উদ্দেশ্য ও কৃৎকৌশলকে ঠিক ঠিকভাবে কাজে লাগাতে গেলে ওপরের পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনাটি এক অনিবার্য অনুষঙ্গ।

লেখাপড়ার পাশাপাশি চলে আনুষঙ্গিক শিক্ষা (স্কলাস্টিক ও কো-স্কলাস্টিক বা ক্যারিকুলার ও কো-ক্যারিকুলার)। এই সহপাঠনিক বা কো-ক্যারিকুলার পড়ুয়াদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে সাহায্য করে। এখন চলেছে 'জীবনশৈলী শিক্ষা'। পড়ুয়াদের মধ্য সুস্থ বোধ, সুস্থ রুচি, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান তৈরী করাও পূর্ণাঙ্গ স্কুল শিক্ষার অন্যতম শর্ত। পরীক্ষা বা মূল্যায়ন ব্যবস্থায় এগুলি এলে পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক চর্চা উৎসাহিত হবে। এসব ক্ষেত্রে লেটার গ্রেড স্কেলে পড়ুয়াদের বিভিন্ন কো-স্কলাস্টিক কাজকর্মের মূল্যায়ন চালু হলে এবং সম্বৎসরের বিষয়গত মূল্যায়নের সঙ্গে যোগ করে ওপরের ক্লাসে ওঠার বিষয় বিবেচিত হলে 'জীবনশৈলী' সমেত অন্যান্য সহপাঠনিক কার্যক্রম অর্থবহ হয়ে উঠবে।

বিদ্যালয়-আভ্যন্তরীণ নিরবচ্ছিন্ন ও সঠিক মূল্যায়ন ব্যবস্থায় গ্রেড পদ্ধতি প্রয়োগে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে মাধ্যমিকে গ্রেড প্রদানের যৌক্তিকতায় শিক্ষকসমাজ, ছাত্রসমাজ ও বৃহত্তর সমাজ আস্থাশীল হবে বলে আশা করা যায়।

দুটি নমুনা গ্রেড-ছক

বিদ্যালয়-আভ্যন্তরীণ নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়নে প্রযোজ্য ১১ পয়েন্ট গ্রেডিং স্কেল		
o +	ভেরি আউটস্ট্যান্ডিং	৯৫-১০০
o	আউটস্ট্যান্ডিং	৯০-৯৪
A++	এক্সসেলেন্ট	৮৫-৮৯
A+	ভেরি গুড	৮০-৮৪
A	গুড	৭০-৭৯
B++	কোয়াইট স্যাটিসফ্যাকটরি	৬০-৬৯
B+	স্যাটিসফ্যাকটরি	৫০-৫৯
B	অ্যাভারেজ	৪০-৪৯
C	মডারেটেলি অ্যাভারেজ	৩০-৩৯
D	আনস্যাটিসফ্যাকটরি	২৫-২৯
F	পুওর	২৫-এর নিচে

মাধ্যমিকে ভাবা যেতে পারে ৭ পয়েন্ট গ্রেডিং স্কেল		
A +	এক্সসেলেন্ট	৯১-১০০
A	ভেরি গুড	৭৬-৯০
B	গুড	৫৬-৭৫
C	স্যাটিসফ্যাকটরি	৪৬-৫৫
D	অ্যাভারেজ	৩১-৪৫
E	আনস্যাটিসফ্যাকটরি	২৫-৩০
F	পুওর	২৫-এর নিচে

• 'শিক্ষা ও সাহিত্য', সেপ্টেম্বর, ২০০৬-এর সৌজন্যে প্রকাশিত।

সদস্য বন্ধুদের প্রতি অনুরোধ

'আহ্বান'-এর জন্য গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধ পাঠান। জেরক্স কপি গ্রাহ্য হবে না।

আপনার বিদ্যালয়ের ইতিহাস পাঠান।

ইউনিট, আঞ্চলিক ও মহকুমা শাখার কর্মসূচির সংবাদ দিন।

পেনশন সেল

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সদস্য বন্ধুদের সার্ভিস বুক ও পেনশন সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হয়।

প্রতিদিন বেলা ২-৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট পর্যন্ত।

দায়িত্বে আছেন—সুশীল গোস্বামী

অপরেশ ভট্টাচার্য

সম্পাদক, জেলা কমিটি, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

গোলোকপতি ভবন, রবীন্দ্রনগর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

প্রবন্ধ

গ্রেডিং সম্পর্কে

অপরেশ ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ২০০৭-এ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গ্রেডেশান পদ্ধতি চালু করতে চলেছেন। প্রচলিত পদ্ধতিতে মূল্যায়নের পরিবর্তে গ্রেডেশান পদ্ধতিতে মূল্যায়ন অধিকতর ত্রুটিমুক্ত বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা- একথা অনস্বীকার্য। মনস্তাত্বিক দিক থেকেও এই পদ্ধতির কার্যকারীতা অনেক বেশি। কাজেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ গৃহীত গ্রেডেশন পদ্ধতিতে মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রশংসনীয় উদ্যোগ সন্দেহ নাই। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাসহ সি বি এস ই, আই সি এস ই ইতিমধ্যেই এই গ্রেডেশান পদ্ধতিতে মূল্যায়নের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। সমগ্র বিশ্বেই আজ মূল্যায়নে গ্রেডেশান পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা স্বীকৃত।

সরকার পোষিত সাধারণের বিদ্যালয় ব্যবস্থায় সংসদ এই কাজ ২০০৭ এ শুরু করলেও যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের সুপারিশ আমাদের দেশের পূর্বের বিভিন্ন শিক্ষা কমিটি বা কমিশনেরও ছিল। যেমন ১৯৮৬ খ্রি. জাতীয় শিক্ষানীতি পুনর্বিবেচনা কমিটি বা রামমূর্তি কমিটি(১৯৯০) পরীক্ষা সংস্কার বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করে।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯০২) মন্তব্য করেছিল ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাদান পরীক্ষামুখী। কিন্ত পরীক্ষা শিক্ষাদান অনুসারী—Teaching in Indian Education stood sub-oridinated to examination and not examination to teaching. MP Hartog কমিটি (১৯২৯) বিদ্যালয় স্তরে অত্যধিক পরীক্ষামুখীনতার নিন্দা করেছে। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রের প্রয়োজনেই এই বিদ্যালয়স্তরের সাধারণ শিক্ষা। জীবনমুখী শিক্ষায় ছাত্রকে এত নিরীক্ষাভিমুখী করে তোলা সম্ভবত মনস্তত্ত্ব বিরোধী। অনুরূপ সমালোচনা—Sargent Plan-(১৯৪৪) এও আছে।

রাধাকৃষ্ণান কমিশন (১৯৪৮)-এর মন্তব্য, শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে পরীক্ষা সংক্রান্ত সংস্কারকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩) পরীক্ষা সংক্রান্ত সংস্কারের বিস্তৃত সুপারিশ করেছে। তাঁরা বহির্মূল্যায়নের সংখ্যা কমানো, নৈব্যর্ক্তিক পরীক্ষার Objective Examination উপর গুরত্ব দিয়েছেন। বিদ্যালয় সঠিক তথ্যপঞ্জীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন, শ্রেণিশিক্ষার উপর গুরুত্ব এবং Numerical Marking এর পরিবর্তে Symbolic Marking উপর গুরুত্ব আরোপ ইত্যাদি সুপারিশ রাখেন। এই কাজ Grading এবং Evaluation জন্য জরুরি। মুদালিয়ার কমিশন '৫' পয়েন্ট স্কেলে মূল্যায়নের সুপারিশ রেখেছেন। এ বিষয়ে কমিশনের মতামত ঃ

Evaluation and Marking

At this stage it is necessary to indicate the actual means to be adopted in evaluation and grading the work of pupils wheather in the external or internai examinations and in maintaining the school records. The present system of evaluating by percentiles, i.e. by numerical marks, out of a hundred, may have certain advantagees but the disadvantages seem to outweigh the advantages. Firstly, it introduces too many subdivisions which are not only useless but cumbersome; and secondly, it is indeed difficult to distinguish between two pupils one of whom obtain, say, 45 marks and another 46 or 47. This system no doubt gives the semblance of accurate judgement which for most of the pupils it is hardly worthwhile to exercise and is beset with many errors. In this connection we would again invite attention to the Hartog Report on 'An Examination of Examinations' which fully reveals the limitations and errors of the system, A simpler and better system is the use of the fie-point scale to which 'A' stands for execellent 'B' for good. 'C' for fair and average, 'D' for poorand 'E' for very poor. In this system pupils are grouped in broad divisions which are more easily distinguishable than the differences indicated by percentile marks. We recommended that his system be adopted for school record.

For written examinations, wheather external or internal, the same scale may be used with this modification that here D and E will be combined to indicate 'failure'. Here 'A' will indicate 'Distinction', B "Credit' and C 'Pass' abd D and E 'Failure' or 'Cases Referred Back'. The values of these categories in terms of percentile marks may be determined by the examining authority. Individual examiners in different subjects may een use the percentile system and then convert the percentile score in terms of categories. The

system recommended here will work in almost all cases except where the distinctions are to be made for the award of scholarships and prizes. In these cases (whose number will always be limited) the system may be modified to introduce a finer scale which may show the difference between two cases which may be almost similar. It must however be admitted that a difference of a few marks on the percentile scale is more often a matter of chance than of exact determination. We note that changes have been introduced in recent years in several universities where candidates who hae secured a first or second class are arranged in the alphabetical order of their names an not as hitherto according to the percentile scale.

We have discussed at some length the general principles of evaluation of school work in view of its extreme importance in education. We now come to offer certain specific and firm recommendations on the subject.

A Single Final Examination

We have referred to the desirability of reducing the number of external examinations. We recommend that there should be only one public examination to indicate the completion of the school course. It may be either the High school final examination or the Higher Secondary Examination depending on the nature of the School where the pupils completes his course. There should be no other public examination before it. The certificate to be awarded to indicate the completion of the Middle School or any other school class will be given by the school itself and it will be based entirely on the school records which will include the results of periodic and annual tests.

কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬) মূল্যায়নের সমস্ত স্তরে পরীক্ষা সংক্রান্ত সংস্কারের সুপারিশ এবং নৈব্যক্তিক ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির উপায় হিসাবে মূল্যায়নকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন। ১৯৮০ খ্রি. সি.এ.বি . ই কমিটিও পরীক্ষা সংক্রান্ত সংস্কারের কথা বলেছেন। ১৯৮৬ খ্রি. National Policy of Education এর মন্তব্য — মূল্যায়ন হল একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি। এতে ছাত্র-ছাত্রী তার কাজের অধিকতর অগ্রগতি ঘটাতে পারে। এই পদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ পরীক্ষার পর ছাত্রের যোগ্যতার ভিত্তিতে শংসাপত্র দানের বিপরীত পদ্ধতি।

NPE (১৯৮৬) পরীক্ষায় রচনাধর্মী প্রশ্ন এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। তারা মুখস্ত বিদ্যার বিরুদ্ধেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিদ্যালয়ে পর্যদ নির্দিষ্ট পাঠক্রম পাঠ্যসূচি অনুসারে এবং পাঠ্যসূচির বাইরের বিষয়ে মাধ্যমিক স্তর থেকে সেমেস্টার পদ্ধতিতে মূল্যায়ন প্রণয়ন ও নম্বরের পরিবর্তে 'গ্রেড' ব্যবহারের কথা বলেছেন। ন্যাশন্যাল পলিসি অফ এডুকেশন (১৯৮৬) কে অনুসরণ করে WCERT পরীক্ষা সংক্রান্ত সংস্কার বিষয়ে একটি জাতীয় আলোচনা চক্রের আহ্বান জানান। সেখানে বিভিন্ন রাজ্যকে একটি নির্দেশিকা পাঠানো হয়। সেই নির্দেশিকায় আহ্বান ছিল— সুসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশ্নপত্র তৈরি, ধারাবাহিক আর্ন্তঃমূল্যায়ন এবং স্কেলিং ও গ্রেডিং এর প্রবর্তন বিষয়ে মতামত প্রদানের।

শিক্ষা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সংসদ CABE, ১৯৮৯-এর জুলাই-এ চূড়ান্ত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে—গ্রেডিং ও স্কেলিং সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সুপারিশ করে। COBSE, ১৯তম বার্ষিক সম্মেলন ১৯৯০ সেপ্টেম্বরে গৃহীত সুপারিশগুলি হল ঃ

- নম্বরের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ফল ঘোষণার পরিবর্তে ৯ পয়েন্ট স্কেলে বর্ণযুক্ত (A+, A, B+, B ইত্যাদি) গ্রেডেশান পদ্ধতি চালু করা।
- রাজ্য পর্ষদগুলির পাবলিক পরীক্ষা লোপ করার কাজে সক্রিয়তা। বিশেষতঃ দশম শ্রেণির শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলপ্রকাশের পরিবর্তে ধারাবাহিক আর্ন্তমূল্যায়নের উপর গুরুত্বদান। মূল্যায়নে প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে গ্রেডেশন পদ্ধতি গ্রহণ।
- উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা চালু।
- মাধ্যমিক স্তর থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেমেস্টার ব্যবস্থা প্রবর্তন।

আলোচনার সুবিধার্থে COBSE প্রকাশিত 'Examination Reforms In India' (1994), [-Analysis of Reports of Commissions and Committees Since Independence] গ্রন্থের অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হল ঃ

"12.10.2 The Indian University Commission (1902) observed that the teaching in Indian education stood subordinated to examination and not examination to teaching. The Hartog Committee (1929) deprecated academic bias of examinations at the school level, geared as they were to the needs of the majority who did not have access to the university system and were to enter life. Similar criticism-was voiced by the Sargent Plan 1944. The Radhakrishnan Commission (1948) pointed out that examination reform was a matter of very high priority in education reform as a whole. The Mudaliar Commission (1952-53) made elaborate recommendations on examination reform and called for reduction in the number of external examinations, conduct of objective tests, assessment of attainments of the students through a proper tests, as-

sessment of attainments of the students through a proper system of school records, weightage for in-school tests, symbolic rather than numerical marking for purposes of evaluation and grading etc. The Education Commission (1964-66) considered the question of examination reform at all stages of education and called for evaluation being construed as a means to assess learner development on an objective basis. The CABE Committee on Examination Reform also made wide ranging recommendations. The National Policy on Education, 1986, envisaged evaluation as a continuous process so that the student would be helped to improve his level of achievement, as distinct from certification of the quality of his performance at a given moment of time. The National Policy on Education, 1986 also considered examinations, as a means for improvement of quality of education. Specifically, it called for removal of subjectivity in examinations, remphasize of memorisation, continuous and comprehensive internal evaluation of scholastic and non-scholastic achievements of students, improvement in the conduct of examinations, introduction of concomitant changes in instructional material and methodology, introduction of the semester system from the secondary stage in a phased manner and use of grades in the place of marks.)

12.10.3 Following up on NPE, 1986, NCERT conducted a National Seminar on Examination Reforms and issued certain guidelines to the States, principally covering the subjects of scaling and grading, continuous comprehensive internal evaluation, setting up of balanced question papers etc.

12.10.4 The CABE, in July, 1989, also recommended that the State Boards should take effective steps in the areas of grading and scaling, continuous comprehensive internal evaluation of scholastic and non-scholastic achievements of students etc. The 19th Annual Conference of the Council of Boards of School Education in India, (COBSE) recommended the following in September, 1990 :

Comprehensive and continuous internal evaluation should be introduced in a phased manner, initially at the elementary stage;

A letter grading system on a nine point scale should be introduced for declaration of individual results by the State Boards by 1995 at the elementary stage. The State Boards should work towards abolition of public examinations, particularly at the end of class X subject to credibility of continuous and comprehensive internal evaluation, stage of reforms effected in grading system and introduction of entrance test for admissions in institutions for higher learning. Introduction of semester system in a phased manner from the secondary stage so that the students are enabled to progress at their own level."

বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্টে প্রমাণিত, প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতির তুলনায় নতুন ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা এবং বাস্তবতা অনেক বেশি। কিন্তু সংসদের এই উদ্যোগ বিভিন্নভাবে সমালোচিত হচ্ছে। সমালোচনার কারণ 'গ্রেডেশানের বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা নিয়ে নয়— সংসদ যেভাবে শিক্ষক -ছাত্র-অভিভাবকের মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই প্রয়োগ করতে চাইছেন- তার যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। ওঠা অস্বাভাবিকও নয়। ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক-এ পাঠক্রম-পাঠ্যসূচির পরিবর্তন হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন যুগোপযোগী করে তোলার আন্তরিক প্রয়াস ছিল। পর্ষদ নতুন ব্যবস্থায় শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির আধুনিকীকরণের বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন। নতুন পাঠক্রম পাঠ্যসূচি শ্রেণিকক্ষে কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, শিক্ষকমশাইরা কীভাবে পরীক্ষার প্রশ্ন করবেন—এসব বিষয় মাথায় রেখেই বিষয়-ভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের অভিমুখীকরণ কর্মশালার আয়োজন অব্যাহত রেখেছেন। প্রসঙ্গতঃ আরো একটি বিষয় স্মরণীয়— মূল্যায়নের ক্ষেত্রে 'স্কেল' নির্ণয়ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং কত নম্বর স্কেলে মূল্যায়ন হবে, সে বিষয়েও আলোচনা হোক। কিন্তু সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এ ধরণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে জানা নেই। এই পরিস্থিতিতে ২০০৭ খ্রি. দ্বাদশ শ্রেণির বিভাজিত পাঠক্রমের চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তে আকস্মিকভাবে গ্রেডেশনে প্রক্রিয়া চালু করে দিলেও তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ভাবনা চিন্তার অবকাশ থেকেই যায়। তার অর্থ এই নয় যে, গ্রেডেশান পদ্ধতিতে মূল্যায়ন বিজ্ঞান সম্মত নয়। এই উন্নত পদ্ধতি প্রণয়ণের পূর্বে যে ভাবধারা ছাত্র-অভিভাবক শিক্ষকদের মধ্যে চলে আসছে সেই ভাবধারা পরিবর্তনের পূর্বে নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-সবার মানসিক পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সংসদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু সংসদ এ বিষয়ে প্রায় নীরব থেকেছেন।

এখন প্রশ্ন কিভাবে ছাত্র-শিক্ষক অবিভাবক এবং শিক্ষানুরাগীদের নতুন ব্যবস্থায় অনুপ্রাণিত করা সম্ভব?

প্রথমত ঃ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আবশ্যিকভাবে মূল্যায়নের এই নতুন বিজ্ঞান সম্পর্কে মনস্তাত্বিক দিক থেকেও গ্রহণীয় করে তোলার জন্য বার বার অভিমুখীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ গ্রেডেশান পদ্ধতিতে ফলপ্রকাশ ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পর্যায়ক্রমে প্রচলন করতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির গ্রহণ যোগ্যতা সুনিশ্চিত করার জন্য পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরতে হবে।

বিদ্যালয়গুলিতে কনভেনশন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার কর্মসূচি চালাতে হবে ধারাবাহিকভাবে। এই বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেও তাদের এই সংক্রান্ত মতামত গ্রহণ এবং সদস্যবন্ধুদের সহযোগিতা করার অনুরোধ জানানো ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এসব কাজ সম্পন্ন হলে শিক্ষক-শিক্ষিকা-ছাত্র অভিভাবক ও জনসাধারণ—সবাইকে নিয়েই নতুন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাফল্য নিশ্চিত হবে।

এখানে আর একটি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। জানা গেছে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ উপরিউক্ত গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কমসূচি গ্রহণ করেছেন। এই প্রেক্ষিতে পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই সংসদ প্রবর্তিত নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি কতখানি কার্যকর হবে- তাও ভেবে দেখা দরকার।

২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষে পুরাতন পাঠক্রম পাঠ্যসূচির সময়েও সংসদ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার (২০০৪) ফল গ্রেডেশান পদ্ধতিতে প্রকাশের ভাবনা চিন্তা করে। কিন্তু আমাদের সমিতি ঐ সময়ে ঐ পদ্ধতি প্রবর্তনের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে বাস্তবতার নিরিখে । তখনও অভিমতও প্রকাশ করে একেবারে সাধারণের শিক্ষার চূড়ান্ত স্তরে নয়- ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পর্যায়ক্রমে এই বৈজ্ঞানিক বিষয়টি প্রবর্তিত হোক। তৎকালীন সংসদ কর্তৃপক্ষ ঐ বছর তাদের সিদ্ধান্ত থেকে বিরত হয়েছিলেন সমিতির যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করে। সমিতি এখনও মনে করে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিভাজিত পাঠক্রম পাঠ্যসূচির চূড়ান্ত পরীক্ষায় মূল্যায়নের প্রশ্নে গৃহীত গ্রেডেশান পদ্ধতির সুফল পুরোপুরি আসবে কী?

- *ধর্মীয় ফ্যাসীবাদ ধ্বংস হোক।*
- *গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদী সংস্কৃতি জিন্দাবাদ।*
- *শিক্ষার সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রাম।*
- *শিক্ষার দাবী জাতীয় দাবী—এ দাবী মানতে হবে।*

সৃষ্টিমগ্ন সোমনাথ হোর-এর জীবনাবসান

১ অক্টোবর, ২০০৬, শিল্পী সোমনাথ হোর (জন্ম ১৯২১, ১৩ এপ্রিল, চট্টগ্রামের বর্মা গ্রামে) চলে গেলেন। থেকে গেল তাঁর অসংখ্য অনুপম শিল্পকীর্তি। সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকা যদি প্রকৃত বাঁচা হয়—শিল্পসৃষ্টির ভুবনে সোমনাথ হোর অজর অমর। একাগ্রচিত্তে নির্মোহ শিক্ষাচর্চার সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। সৃষ্টি-মগ্ন মানুষটি কাজের মধ্যেই অবকাশের আনন্দ খুঁজে পেতেন। কারণ অনুভবের মধ্যে হারিয়ে যেতে না পারলে মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়। সোমনাথের শিল্পজীবন আর ব্যক্তিজীবনচর্যায় কোনো পার্থক্য ছিল না। ব্যক্তিজীবনেও কথায় এবং কাজের মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য ছিল। নিজের সঙ্গে ছলনা, অন্যের সঙ্গে চাতুরি—সোমনাথের জীবনদর্শন বিরোধী ছিল। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ ঃ—"দৃপ্ত ঐশ্বর্যে তিনি ছিলেন অটল—যা বিশ্বাস করতেন তা কেবলই তত্ত্ব নয়, ছিল উপলব্ধ সত্য। তাই যখন আর্ত মানুষের পাশে গিয়ে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, সেখানে তিনি নিজেকে আলাদা করে রাখেন নি। তারাও তাঁকে নিজেদেরই আত্মার আত্মীয় মনে করত। সোমনাথদাকে অর্থের ঐশ্বর্য দিয়ে যেমন কেনা যাবে না, তেমন তাঁকে নিলামঘরের কাঠগোড়ায় দাঁড় করানোও যাবে না। তাঁর জীবনে অর্থের প্রয়োজন ছিল না, একথা আমি বলি না। আমি বলি অর্থ তাঁর শিল্পের পরমার্থকে কেড়ে নিতে পারেনি। সোমনাথদার রচনায় যেমন কোথাও শৈথিল্য ছিল না, তেমনই বিশেষ কাউকে খুশি করার মনও কাজ করেনি।

সোমনাথদার শিল্পবিগ্রহের সামনে দাঁড়ালে কেবল ভাঙা দেখি না, দেখি পূর্ণকে। আমরা যে ড্রইং-এর কথা বলি, তারও বিলুপ্তি ঘটে ওঁর অভিব্যক্তির ধ্বনির কাছে। শিল্পীর আত্মসন্তোষমূলক জীবনবোধের পূর্ণ ক্ষেত্র ছিল শান্তিনিকেতনের আশ্রম। এখানকার আলো-বাতাস-জনজাতি, তার বনানি, তার নিত্য ওঠাবসার জীবনছন্দ। তাঁর স্বভাবে, অদ্ভুত এক মধুরতার সঙ্গে সরসতা কাজ করত। কিন্তু এর মধ্যেও ফুটে বেরত তাঁর ভিতরের দৃঢ়তা। আজ কিঙ্করদাকে মনে হয়, মনে হয় বিনোদবিহারীকে। তাঁদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য শিল্পীর জীবনবোধের পথে একটা মস্ত দিক ছিল।'..... আমাদের গাঁয়ের চাষী চরণকাকা বলেছিলেন, দাদাবাবু ভালবাসারও বাস হয়। যেমন কাঁচা ধান আর পাকা ধানে হয়। আজ তো বলতেই পারি, চরণকাকা, তোমার ওই বাসের স্পর্শ পাই তো সোমনাথদার সৃষ্টিবিগ্রহের পাশে দাঁড়ালে। তাঁর শিল্পকর্মে ছিল এক বিস্ময়কর আলো, যা সবকিছু ছাপিয়ে মনকে অধিকার করে নেয়। পথে পথে অমন অনুভবের বিষয়, তবু আমাদের তাকে ধরা হল না। তাঁর 'ক্ষত' এই বিষয়ের পটের সামনে দাঁড়ালে কেবল তা পটের ছবি দেখি না। মনে হয় এই ক্ষতের বেদনার দাহ স্রষ্টার অন্তর থেকে উদ্গত না হলে এমনটি হতে পারে না।

সোমনাথদার জীবনে সহজ চলাফেরা, মেলামেশা তাঁর শিল্পজীবনের মধ্যেই একে অপরের সঙ্গে যূথবদ্ধভাবে অবস্থান করেছে।

সোমনাথদা যে পূর্ব বাংলার সন্তান, সে ভূমির একটি আচরণ আজ বার বার মনে হচ্ছে। সেখানে একটি মঙ্গল বাচন আছে—কেউ গেলে বলেন 'যাওন নাই'। সোমনাথদারও যাওন নাই। সোমনাথদাই তাঁর ভেতর দিয়ে আর এক সোমনাথকে আমাদের কাছে দিয়ে গেছেন, যার যাওন নাই।"

সমিতির বিদ্যালয় শাখা সম্পর্কে কিছু ভাবনা

অরুণ চৌধুরী

[১৯৮০ খ্রিঃ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কাঁথি সম্মেলনে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ভাবনা প্রচারের লক্ষ্য গঠনতন্ত্রে স্বীকৃত হয়। একই সঙ্গে সংগঠনের সর্বনিম্ন ধাপ হিসাবে বিদ্যালয় শাখা গঠনের আনুষ্ঠানিক গঠনতান্ত্রিক প্রস্তাবও গৃহীত হয়। তৎকালীন পরিস্থিতির ভিত্তিতে বিদ্যালয় শাখার ভূমিকা, আন্দোলনের অভিমুখ, বিদ্যালয় শাখার আলোচ্য বিষয় ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে মেদিনীপুর জেলা কমিটির তৎকালীন সম্পাদক (১৯৭৪-১৯৮৪) এবং ওয়ার্কিং এণ্ড ফিনান্স কমিটির সদস্য অরুণ চৌধুরীর এই প্রবন্ধ 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-(১৯৮৩, ফেব্রুয়ারী)-এ প্রকাশিত হয়।

বিগত ২৫-২৬ বছরে একাজে কতটা সাফল্য এসেছে, সমিতির সদস্যদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ভাবনার প্রসার কতটা সম্প্রসারিত হয়েছে বা বিদ্যালয় শাখা কতটা শক্তিশালী হল তা যাচাই করার সময় এসেছে। সেই ভাবনা থেকেই বর্তমান 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-এর পৃষ্ঠা থেকে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় ইউনিট সম্পর্কে সদস্যবন্ধুদের লেখা পাঠানোর আহ্বান জানানো হচ্ছে]

ভূমিকা ঃ

কোনও কিছুই পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে জন্মায় না। প্রাথমিক রূপ ধীরে ধীরে বাস্তব অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে বিকাশলাভ করে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চলার সময় নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে এবং সেই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমিতির সাংগঠনিক কাঠামো বিকাশলাভ করেছে। সমিতির জন্মলগ্নে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় স্তরের সংগঠনই ছিল। জেলা, মহকুমা বা অঞ্চল কোনও স্তরেই কোন কমিটি ছিল না। পরবর্তী স্তরে ১৯২৯-৩০ সালে জেলা সংগঠন তৈরী হয় এবং ১৯৪৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে যখন সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চলছে তখন মহকুমা সংগ্রাম কমিটি তৈরী হয় যা ১৯৫২ সালের শিলিগুড়ি সম্মেলনে সংবিধানে স্বীকৃত হল। ১৯৫৪-র ঐতিহাসিক সংগ্রামের সাফল্য পরবর্তী বছরগুলির শিক্ষা আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। তখন থেকেই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানে থানাভিত্তিক আঞ্চলিক এ্যাকশন্ কমিটি গড়ে ওঠে। ১৯৬৪-৬৫-তে আবার সংবিধান পরিবর্তন হয় এবং সংবিধানে আঞ্চলিক কমিটির গঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়। সংবিধানে স্বীকৃত হলেও প্রত্যেক অঞ্চলেই সমিতির সংগঠন গড়া তখনই সম্ভব হয়নি কারণ এজন্য প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত কর্মী এবং যথেষ্ট উদ্যোগ। সত্তরের দশকে গণ-আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর শাসকশ্রেণির পরিকল্পিত আক্রমণ যত তীব্র ও বিস্তৃত হতে থাকল ততই সমিতির ঐক্য, বিদ্যালয়ে সমিতির সদস্য ও অন্যান্য সমিতি ও গণ-আন্দোলন-এর কর্মীদের এবং সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশ রক্ষার তাগিদে বিশাল স্তরে ঐক্যকে দৃঢ়বদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকল। ১৯৮০-তে কাঁথি সম্মেলনে সংশোধিত সংবিধানে বিদ্যালয়ে সমিতির শাখা গড়ার কথা বলা হল। বিদ্যালয় শাখা গড়ার কাজ এখনও চলছে—তা সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু ইতোমধ্যে বিদ্যালয় শাখা গড়ার কাজে যে অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করেছি সারা রাজ্যে সমিতির বিভিন্ন স্তরে তার বিনিময় হওয়া উচিত এবং তাহলেই একইভাবে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হওয়া সম্ভব হবে।

সমিতির বিদ্যালয় শাখা সেই বিদ্যালয়ে চাকুরীরত সেইসব শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে গঠিত হবে যাঁরা সমিতির সদস্য—তাঁদের প্রতিনিধিদের নিয়ে নয়। বিদ্যালয় শাখা হল সমিতির সর্বনিম্ন শাখা বা ভিত্তিভূমি যার উপর নির্ভর করছে সমিতির শক্তি, তার সাফল্য।

অনেক সময়েই Staff Council-এর সঙ্গে সমিতির শাখাকে গুলিয়ে ফেলা হয়। সচেতনভাবে আমাদের এটা বোঝা দরকার যে দুটির চরিত্র, ব্যাপ্তি, কাজের পরিধির মধ্যে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যগুলি মূলতঃ একটা পার্থক্য থেকেই উদ্ভুত। তা হল সরকারী আইনে Staff Council স্বীকৃত যার কাজের সীমা কেবলমাত্র সেই বিদ্যালয়; আর সমিতির বিদ্যালয় শাখা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অর্থাৎ এই শাখার কাজ সমিতির কাজ।

গুরুত্ব ঃ

শিক্ষা ও গণ-আন্দোলনের প্রয়োজনেই সমিতির বিদ্যালয় শাখা তৈরী হয়েছে। কাজেই সমিতির কাজে এই শাখার গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্যালয় শাখাগুলি যতটা শক্তিশালী সমিতিও তদনুরূপ শক্তিশালী। বিদ্যালয় শাখার সমিতির সদস্যবন্ধুরা যতটা ঐক্যবদ্ধ সমিতির ঐক্যও ততটাই দৃঢ়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শরিক

সমিতি। বিদ্যালয় শাখার ঐক্যশক্তি স্বাভাবিকভাবেই এলাকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রতিফলিত হবে। সমিতির নিজস্ব সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর জনসমাজের আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি— উভয় ক্ষেত্রেই সমিতির বিদ্যালয় শাখার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কাজেই সমিতির বিদ্যালয় শাখাকে শিক্ষা ও গণ-আন্দোলন থেকে উদ্ভুত সমিতির মতাদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার কাজ আজকের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম গড়ে তোলার ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বিদ্যালয় শাখা গঠনের এই গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকেই এই শাখাগুলি গড়ার এবং পরিচালনার কাজে নামতে হবে সাহসের সঙ্গে এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক।

সমিতির দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ঃ

সমিতি কোন ব্যক্তির বা দলের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত নয়। সমিতি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা করেছে এবং এই আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা সঞ্চয় করেছে তাই-ই হচ্ছে সমিতির মূল পরিচালিকা নীতি। কাজেই সেই সুদীর্ঘ সংগ্রাম থেকে যে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসূচক দিকগুলি আমাদের জানা ও বোঝা দরকার, অন্যথায় ভুলপথে পরিচালিত হওয়ার আশংকা আছে। সংক্ষেপে বৈশিষ্ট্যসূচক দিকগুলিকে এভাবে উপস্থাপিত করা যায়।

সমাজ কাঠামোর চরিত্রের উপর শিক্ষার চরিত্র নির্ভরশীল। অর্থাৎ সমাজের উপর যখন যে শ্রেণি প্রভুত্ব করে সেই শ্রেণির স্বার্থেই শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কাজেই সমাজ কাঠামো পরিবর্তিত হলে তবেই শিক্ষা কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব। এটা শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণ সীমা। কিন্তু পুরানো সমাজের মধ্যে নতুন সমাজ বিকাশের শক্তির যে সংগ্রাম তা নতুন নতুন দাবী এবং সংগ্রাম সৃষ্টি করে। এটাই আমাদের সংগ্রামের অবজেকটিভিটি বা বাস্তব ভিত্তি যার উপর দাঁড়িয়ে আছে সংগঠন ও সংগ্রামের রূপ। সমাজের বিভিন্ন স্তরের খেটে-খাওয়া মানুষের সংগ্রাম যখন বোঝে যে বর্তমান সমাজব্যবস্থাই তাদের সমস্ত দুঃখ-বঞ্চনার কারণ তখনই সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের সংগ্রামের শক্ত ভিত তৈরী হয়।

পুঁজিবাদ তার জন্মলগ্নেই শিক্ষায় সকলের সমান অধিকারের কথা ঘোষণা করলেও বাস্তবে তা কার্যকর করেনি। তার নিজের শ্রেণির স্বার্থই এর কারণ। ইংলণ্ড-আমেরিকাতে আজও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষ আছে। ভারতের শাসকশ্রেণি ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ের যুগে ধনতন্ত্র গড়ার চেষ্টার ফলে সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করার পরিবর্তে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করেছে। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে জনগণের শিক্ষার অধিকারের ঢালাও প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তা বাস্তবায়িত তো হয়ইনি বরং শিক্ষার অধিকার সঙ্কুচিত করা হচ্ছে।

এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় এঙ্গেলসের সেই বিখ্যাত উক্তি— "বুর্জোয়া শ্রেণি যেহেতু শ্রমিকের ততটুকুই জীবনধারণের স্বীকৃতি দেয় যতটুকু নিতান্ত প্রয়োজন। সুতরাং আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই যে তারা শ্রমিককে ততটুকু শিক্ষার সুযোগ দেয়, যতটুকু তাদের নিজেদের স্বার্থে প্রয়োজন।"

একমাত্র আমূল ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির বন্ধ্যাত্ব দূর করে শিক্ষার ঘোষিত অধিকারকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব। এখানেই কৃষকদের জমির অধিকার এবং তা রক্ষা, ক্ষেতমজুরের মজুরী বৃদ্ধি, বর্গাদারদের বর্গার অধিকার এবং তা রক্ষার সংগ্রামের সঙ্গে শিক্ষার সংগ্রামের সম্পর্ক।

গণতান্ত্রিক পরিবেশ ভিন্ন সুস্থ শিক্ষা সম্ভব নয়। তাই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার ও বিকাশের সংগ্রামের সঙ্গে শিক্ষার সংগ্রাম অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

অপসংস্কৃতির বিকাশও ঘটবে আর তার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থাও বিকাশলাভ করবে এটা সম্ভব নয়। এ দুটি পরস্পর বিরোধী। তাই সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষের সংগ্রামের সঙ্গে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে সংগ্রামের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

শিক্ষা আজ সমাজ বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার রূপে চিহ্নিত। কাজেই সমাজ বিকাশের সংগ্রামের সঙ্গে গণতান্ত্রিক শিক্ষার পক্ষের সংগ্রাম অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

সমাজতন্ত্রের সপক্ষে সংগ্রামের জন্য চাই সচেতনতা। এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র সম্পর্কে প্রচারের লক্ষ্য সমিতি গ্রহণ করেছে।

সংগ্রামের কৌশল সম্পর্কে সমিতির দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সমিতির আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কৌশল বারে বারে পরিবর্তিত হয়েছে। মূলতঃ দুটি বিষয়ের পর্যালোচনা করে আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। (ক) রাজ্য সরকারের ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমাজের সম্পর্ক এবং (খ) শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমাজ যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের চেতনা ও সাংগঠনিক শক্তির মান।

সমিতি জন্মলগ্ন থেকে ১৯৪৬-৪৭ পর্যন্ত মূলতঃ আবেদন-নিবেদনের পথেই চলত। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত স্তরে স্তরে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পথে সমিতি তার আন্দোলনকে ধর্মঘট বা কার্যবিরতির স্তর পর্যন্ত উন্নীত করেছে। কিন্তু ১৯৬৬ সালে প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার যখন জনস্বার্থ ও শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করল তখন স্বভাবতই সমিতি সরকার পরিবর্তনের আহ্বান দিয়েছিল। এই আহ্বান শিক্ষক

ও শিক্ষাকর্মী সমাজের কাছে ঠিক সেই সময়েই রাখা হয়েছিল যখন তাঁরা আন্দোলনের পরবর্তী ধাপ কি হবে এই প্রশ্নে বিভ্রান্ত ছিল এবং সমিতির দায়িত্ব ছিল সেই আন্দোলন ও সাংগঠনিক সংকটের মুহূর্তে পথ দেখানোর। সমিতি ঠিকভাবেই একাজ করেছিল।

সরকার সম্পর্কে সমিতির দৃষ্টিভঙ্গিও আন্দোলন সংক্রান্ত কৌশলের প্রশ্নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। '৬৭ এবং '৬৯-এর যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং বর্তমানের বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের সংগ্রামী খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে তাদের আর্থিক ও সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও খেটে-খাওয়া মানুষের দাবী দাওয়া সম্পর্কে সহানুভূতিশীল। বামফ্রন্ট সরকার যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে তা জনস্বার্থবাহী এবং সমিতির ও গণ-আন্দোনের দীর্ঘদিনের দাবীগুলিরই প্রতিফলন।

এখানেই পূর্বের কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের মধ্যে পার্থক্য। একটি শিক্ষা ও জনস্বার্থবিরোধী, অপরটি শিক্ষা ও জনস্বার্থবাহী। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই এই দুই সরকার সম্পর্কে সমিতি ও অন্যান্য সংগ্রামী গণ-সংগঠনগুলির দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য আছে। একটির সঙ্গে সম্পর্ক শত্রুতামূলক এবং অপরটির সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক এবং এই মৌলিক পার্থক্যের কারণেই আন্দোলনের রূপের পার্থক্য ঘটে। বামফ্রন্ট শাসন ক্ষমতায় থাকার জন্য পরিস্থিতির যে পরিবর্তন ঘটেছে তার ফলেই সমিতির আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনও সীমাবদ্ধ কেবলমাত্র বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিষয়ে। কিন্তু এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী তথা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুণগত কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। পরিপ্রেক্ষিতের এই পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন না থাকলে আন্দোলনের রূপের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে, এবং যা ঘটেছে সঠিকভাবেই, তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে না এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে।

বিদ্যালয় শাখাগুলির বর্তমান অবস্থা ঃ

বিদ্যালয়গুলিতে কার্যতঃ কোনও ইউনিট নেই, অথবা ইউনিট থাকলেও তা সক্রিয় নয়। অর্থাৎ সমিতির দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বিদ্যালয়ে শাখার সদস্যদের মধ্যেকার সুদৃঢ় ঐক্যের অভাব আছে। আবার সমিতির প্রতি ভালবাসাও আছে। বিভিন্ন মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটে সদস্যবন্ধুদের কথা ও কাজের মধ্যে যা অনেক সময়েই সমিতি বিরোধী, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই সমিতিকে ভালবাসেন, সমিতির প্রতি আস্থাশীল। সমিতির প্রতি আস্থাশীল হওয়া সত্বেও সমিতির দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে একমত নন বলেই সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উৎসাহবোধ করেন না; ফলে সমিতির প্রতি তাঁদের আস্থা, তাঁদের ভালবাসা সমিতির সংগঠনে বা আন্দোলনে প্রতিফলিত হয় না। সকল সদস্যকে ঐক্যবদ্ধ করার পথে বাধাগুলি কি কি? কেন এই ঐক্য গড়ে ওঠেনি?

সমিতির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাধারণ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের আমরা ঐক্যমত করতে পারিনি। এ কাজে আমাদের সংগঠনের পরিকল্পনা ও উদ্যোগের যথেষ্ঠ অভাব আছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। একাজের গুরুত্বও আমরা ঠিক ঠিকভাবে উপলব্ধি করি না। মতপার্থক্য কোন কোন বিষয়ে আছে।

সমিতির মতাদর্শের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা হয়েছে, সেই সব বিষয়গুলি সম্পর্কেই শিক্ষা ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। অর্থাৎ শিক্ষার যে একটা শ্রেণি চরিত্র আছে এ বিষয়ে সকল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী যাঁরা সমিতির সদস্য তাঁরা একমত নন, একমত নন সমাজ বিকাশের ধারার সঙ্গে শিক্ষা পদ্ধতির বিকাশের সম্পর্ক সম্পর্কে। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ তথা ভূমি সংস্কার, বর্গা অপারেশন বা ক্ষেতমজুরের বা অন্যান্য স্তরের মানুষের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের সম্পর্ক সম্পর্কে। অথবা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কিংবা সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষের সংগ্রাম যে আমাদের সংগ্রাম এ চিন্তার তো আমরা একমত নই। কোন কোনও শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধু বা এমনকি কোন কোন কর্মীবন্ধুর মনেও এ প্রশ্ন জাগে (কখনও কখনও তাঁরা খোলাখুলি প্রশ্নটা করেও ফেলেন) যে সমিতি কি তার সংগ্রামী চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে? অর্থাৎ পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে সমিতির সংগ্রামের রূপের পরিবর্তন যে সময়োপযোগী এবং যুক্তিসংগত এ সম্পর্কে তাঁরা একমত নন। সর্বোপরি শিক্ষক হিসাবে যে আমার সমাজের প্রতি কর্তব্য আছে সে সম্পর্কে আমাদের চেতনা আমাদের অবস্থানের উপযোগী নয়।

এসব বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মতপার্থক্য বা দ্বিধা কেন? বিষয়টা হল দুই পরস্পরবিরোধী মতাদর্শের তথা সমাজ এবং সমাজে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের ভূমিকা সম্পর্কে দুই পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির সংগ্রাম।

বর্গা চাষীর নামে বর্গা রেকর্ড করানো, ক্ষেতমজুরের মজুরী বৃদ্ধির সময় আমরা আমাদের, কেবলমাত্র আমাদের, অর্থনৈতিক অবস্থানটাকে রক্ষার কথাই ভাবি। একথা ভাবি না যে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী বর্গাচাষী বা ক্ষেতমজুর সবাই একই ধনতান্ত্রিক শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছি—আমাদের চাকুরী তথা সামাজিক নিরাপত্তার কথাটাই ভাবি, ভাবি না বর্গাদার বা ক্ষেতমজুরের নিরাপত্তা বা বেঁচে থাকার অধিকারের কথা। একথা আমরা ভাবি না যে একই শোষণযন্ত্রের দ্বারা যখন আমরা সবাই নিষ্পেষিত হচ্ছি তখন সবারই ঐক্যবদ্ধভাবে সেই ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রয়োজন। আমরা ভাবি না যে গরীব চাষী ক্ষেতমজুরদের কোনরকমে বাঁচার উপযোগী আর্থিক

নিরাপত্তা না থাকলে তাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসবে না—অনেক বিদ্যালয়ই বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে আমরা সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে বিরোধীতায় নেমে পড়তে দ্বিধা করি না—প্রয়োজনে আমাদের সামান্য, অত্যন্ত সামান্য ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার জন্য সমিতির সদস্য হওয়া সত্বেও সমিতির প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে পরিত্যাগ করি। আমরা তখন ভুলে যাই যে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিরাপত্তা তথা শিক্ষা আন্দোলন এমনকি ছাত্রদের শ্রেণিকক্ষে আমরা যা শিক্ষা দিই তারই বিরোধিতা করছি। কিংবা যখন নানা কারণ দেখিয়ে সমিতির কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এড়িয়ে যাই তখন একথা ভাবতেই পারি না যে আমাদের অজ্ঞাতে ধনতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দর্শনের দ্বারা এমন গভীরভাবে প্রভাবিত যে তা সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনের, যার কথা ছাত্রদের বা অন্যের কাছে আমরা মুখে অনর্গল বলে থাকি, সেই সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনের থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখি। এখানে আমরা বুর্জোয়া মতাদর্শের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদেরই শিকার হয়ে প্রগতিশীল সামাজিক দায়-দায়িত্ববোধক ধ্যান-ধারণার বিরোধিতায় নিজেদের অজ্ঞাতেই নেমে পড়েছি। অথবা যখন আমরা সমিতির সংগ্রামের কৌশল পরিবর্তনের ব্যাপারটা ধরতে সক্ষম না হয়ে সমিতি তার সংগ্রামী চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে একথা ভাবি তখন সংগ্রামের রূপ নির্ধারণের মূল ভিত্তির কথাই ভুলে যাই। আমরা ভুলে যাই যে দুই সরকারের (কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট) মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে—এই দুই সরকারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মৌলিক পার্থক্য আছে—আমরা ভাবি যে বামফ্রন্ট সরকার এবং কংগ্রেস সরকার মূলতঃ একই এবং সেই কারণেই সমিতির কৌশলের পরিবর্তন অযৌক্তিক। আমাদের আত্মসমীক্ষা করতে হবে যে আমরা কোন্ দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করছি এবং নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের কোন্ দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করা প্রয়োজন।

বাধাগুলি কিভাবে দূর করা যাবে? এই সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব, মতাদর্শের পার্থক্যের বিবরণগুলিকে আত্মবিশ্বাস এবং সাহসের সঙ্গে আঞ্চলিক স্তরে এবং বিদ্যালয় শাখার সভায়, যেখানে আমরা সবচেয়ে কাছাকাছি আছি সেখানে, আলোচনা তথা মতাদর্শের সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। তবে এ বিষয়ে কর্মীদের সচেতন থাকতে হবে যে এই মতাদর্শের সংগ্রাম কেবলমাত্র সংগ্রামের জন্য নয় বরং বৃহত্তর ও সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলার জন্য। কাজেই আমাদের শিখতে হবে কিভাবে একই সঙ্গে ঐক্য ও সংগ্রামের কাজ চালাতে হয় এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে একাজ করতে হবে। প্রয়োজন সতর্কতার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার এবং একাজ পরিচালনার উপযোগী সুশিক্ষিত ও সৎ কর্মীবাহিনী। কেন্দ্রীয় কমিটির সচেতন পরিচালনাতেই এ কাজ হতে পারে তা না হলে মারাত্মক ভুল ও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে—সংগঠনকে দৃঢ়বদ্ধ ও শক্তিশালী করার পরিবর্তে সংগঠনকে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার যথেষ্ঠ আশংকা আছে। সেজন্যই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থে সংগ্রাম করতে গিয়ে সমিতি কিভাবে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষাগুলি পেয়েছে তা আমাদের বুঝতে হবে এবং সমগ্র শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের কাছে উপস্থাপিত করতে হবে—বিচ্ছিন্নভাবে কোনও দৃষ্টিভঙ্গি বা মতাদর্শের আলোচনার মধ্যে দিয়ে নয়।

সমিতির বিদ্যালয় শাখা এবং আঞ্চলিক স্তরই এই সংগ্রাম পরিচালনার একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র। সাহসের সঙ্গে যদি বিদ্যালয় শাখাগুলিকে পরিচালনা করা যায় তবেই আশানুরূপ ফল লাভ সম্ভব।

নির্দিষ্ট সময়ান্তরে সভ্য করা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সভা পরিচালনা করা, বিদ্যালয় শাখার বক্তব্য আঞ্চলিক কমিটির কাছে রাখা এবং আঞ্চলিক কমিটির সিদ্ধান্ত বিদ্যালয় শাখায় উপস্থাপিত করা এবং তা কার্যকর করার চেষ্টা, পরবর্তী সভায় তা পর্যালোচনা করা ইত্যাদি সাংগঠনিক নীতিগুলি মেনে চললে ধীরে ধীরে বিদ্যালয় শাখার যৌথ নেতৃত্ব গড়ে উঠবে এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি বাস্তবায়িত হবে। তখনই, এবং তখনই, মতাদর্শের সংগ্রাম ও সমিতির মধ্যেকার দৃঢ়বদ্ধ ঐক্যের মধ্যে সেতু বন্ধন সম্ভব হবে। আর এই সুদৃঢ় ঐক্যের ভিত্তিতে সর্বস্তরের মেহনতী মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সার্থকভাবে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমাজের অংশগ্রহণ সম্ভব হবে।

———

- ❒ শিক্ষার দাবী জাতীয় দাবী
- ❒ শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাজেটের দশ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে।
- ❒ শিক্ষাকে রাজ্য তালিকায় ফিরিয়ে দিতে হবে।
- ❒ পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বনাশা নীতির ফলে সাধারণের বিদ্যালয় ব্যবস্থা আক্রান্ত—ইউ.পি.এ. সরকারকে এ আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে।
- ❒ সাম্রাজ্যবাদ-সন্ত্রাসবাদ-মৌলবাদ ধ্বংস হোক।

বিশ্বশান্তি আন্দোলন ও এক মহাবিজ্ঞানী

পার্থ ঘোষ
শিক্ষক, চাঠরা কুঞ্জরানী বাণী ভবন
রামতারকহাট, পূর্ব মেদিনীপুর

'হুকুমমাফিক বীরত্ব, অর্থহীন হিংসা আর জাতীয়তার নামে যে জঘন্যতা চলে, তাকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। যুদ্ধ আমার কাছে ঘৃণ্য জঘন্যতা। আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেও আমি এই ন্যাক্কারজনক ব্যাপারে যোগ দেব না।' এই স্মরণীয় উক্তিটি বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃত অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের। এই মন্তব্যের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ এক মহাবিজ্ঞানীর শান্তিকামী মানসিকতা তথা মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হৃদয়ের আর্তি সকলের বোধগম্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম জার্মানীর 'উলম্' শহরে এক ইহুদী পরিবারে, ১৮৭৯ সালের ১৪মার্চ। ছেলেবেলায় অ্যালবার্ট ছিলেন বেশ গম্ভীর এবং কিছুটা চাপা প্রকৃতির। যুদ্ধের বাজনা ও সৈন্যদের কুচকাওয়াজ তিনি ছেলেবেলা থেকেই একদম পছন্দ করতেন না। অথচ এই ব্যাণ্ডের আওয়াজ প্রায় সব বাচ্চারাই পছন্দ করে। কিন্তু অ্যালবার্ট ছিলেন একদম ব্যতিক্রম। এই অনুভূতিই তাঁকে ভবিষ্যৎ জীবনে এক মহান শান্তিবাদী হিসাবে গড়ে তুলেছিল।

আইনস্টাইনের পড়াশুনো শুরু হয় মিউনিখের স্কুলে। ছাত্রজীবনে তিনি বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেননি, কিন্তু প্রথাগত শিক্ষার বাইরে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল প্রবল। গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি ছোটবেলা থেকেই তাঁর গভীর অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত জুরিখ পলিটেকনিক কলেজে অধ্যয়ন করার সময় আইনস্টাইন কলেজের লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরীতেই বেশিরভাগ সময় কাটাতেন। তিনি হাতে-কলমে পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষা করার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন।

ছোটবেলায় আইনস্টাইন তাঁর মায়ের কাছ থেকে বেহালা ও পিয়ানো বাজানোয় তালিম নিয়েছিলেন। একমাত্র সুরের জগতে গিয়ে তিনি মানসিক অবসাদ বিস্মৃত হওয়ার চেষ্টা চালাতেন। তিনি মনে করতেন, যে নিয়মে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলে, সুরের জগৎ ঠিক সেই নিয়মেই চলে। মানুষের জীবনে সঙ্গীত একটা শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আজীবন শান্তিকামী একজন মানুষের মনে যে সঙ্গীত স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করবে এটাই স্বাভাবিক।

স্নাতক হওয়ার পরে আইনস্টাইন বহু কষ্টে সুইজারল্যাণ্ডের বার্ণ শহরে এক পেটেন্ট অফিসে সামান্য কেরানীর চাকরি পেলেন। সারাদিন অফিসে কাজ করার পরে সন্ধ্যাবেলা থেকে গভীর রাত অবধি চলতো সৃষ্টির তাগিদে তাঁর বিজ্ঞান-গবেষণা। বিজ্ঞান-গবেষণার জন্য আইনস্টাইনের সুসজ্জিত আধুনিক গবেষণাগারের কোনদিনই প্রয়োজন হয়নি। একটুকরো পেনসিল, কিছু কাগজ এবং রাশি রাশি গাণিতিক সংখ্যার সমন্বয়ে পরবর্তীকালে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে তিনি ঘটিয়েছেন বিপ্লব। মস্তিষ্কই ছিল তাঁর গবেষণাগার।

১৯০৫ সাল। মাত্র ২৬ বছর বয়সে আইনস্টাইন আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, ব্রাউনীয় বিচলন তত্ত্ব এবং বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব সংক্রান্ত তিন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করলেন—যা তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এত অল্প বয়সে এর পূর্বে কোনও বিজ্ঞানী এতগুলি মৌলিক তথ্যসমৃদ্ধ বিষয় আবিষ্কার করতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁর পড়াশুনো হল না, কোন গুরুর কাছে যিনি পাঠ নিলেন না—এহেন এক মানুষ বৈপ্লবিক চিন্তায় বিজ্ঞান জগতে হলেন মহানায়ক। পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র যুক্তি ও গণিতকে অবলম্বন করে তুলে ধরলেন তাঁর সব বৈপ্লবিক অসম্ভব সুন্দর সব তত্ত্ব। এইসব তত্ত্ব দিয়েই বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানে জোয়ার এসেছিল। তাই বিংশ শতাব্দীকে বলা হয় আইনস্টাইনীয় শতাব্দী। পাশাপাশি ১৯০৫ সালকে অভিহিত করা হয় বিস্ময়কর বছর হিসাবে। প্রসঙ্গত, ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের ঐ তিনটি বিশাল মাপের আবিষ্কারের ২০০৫ সালে শতবর্ষ পূর্ণ হল। চিরস্মরণীয় আবিষ্কারগুলির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘ ২০০৫ সালকে আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান বর্ষ (আইনস্টাইন বর্ষ) হিসাবে ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জন্য ১৯২১ সালে আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

১৯১৬ সালে আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের বর্ধিত রূপ সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন—যে তত্ত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-রহস্য উদ্‌ঘাটনে অনেকটাই সাহায্য করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানী মহলে সাধারণ

আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই তত্ত্ব গণিতবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার মৌলিক ভিত্তিতে আমূল বিপ্লব ঘটায়। পদার্থবিজ্ঞানীরা উপলব্ধিকরলেন—এত উঁচুমানের তাত্ত্বিক আবিষ্কার পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে বিরল। আইনস্টাইনের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। প্রাগ, জুরিখ, বার্লিন ও আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনস্টাইনের কাছে প্রস্তাব আসে অধ্যাপক পদ গ্রহণ করার জন্য। সেই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসতে লাগল তাঁর উদ্ভাবিত সাধারণ ও বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের উপর বক্তব্য রাখার জন্য। আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এই মহাবিজ্ঞানী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যেতে লাগলেন—লক্ষ্য করলেন তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা।

আইনস্টাইনের আগে পর্যন্ত পদার্থ ও শক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যে ধারণা ছিল, আইনস্টাইন তার মূলে কুঠারাঘাত করলেন একটি মাত্র সূত্রের সাহায্যে। তিনি বললেন, পদার্থ আর শক্তি একই। একটার অপরটায় রূপান্তর সম্ভব। অঙ্ক কষে তিনি সূত্র বের করলেন $E = mc^2$, যেখানে E হচ্ছে শক্তি, m হচ্ছে ভর এবং c শূন্যে বা বায়ুমণ্ডলে আলোর গতিবেগ। এই সূত্র অনুসারে বলা যায় যে, মাত্র এক গ্রাম ওজনের কোন বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে যে অপরিমিত শক্তির উদ্ভব হয় তা মানুষের কল্পনার বাইরে। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের অন্তর্গত এই বিখ্যাত তথা যুগান্তকারী সূত্রকে অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে তৈরি হয় পারমাণবিক বোমা।

১৯২১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে করতে জার্মানী যখন একটা গভীর আর্থিক সঙ্কট তথা রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে চলেছে, তখন আবার যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়ার আহ্বান জানিয়ে লেখা একটি প্রচারপত্রে সই করানোর জন্য একদিন আইনস্টাইনের কাছে এল কিছু নাৎসী যুবক। এই প্রচারপত্রে কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সই ছিল। আইনস্টাইন এতে প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'এ যুদ্ধ ঘোর পাপাচার ও নিষ্ঠুর অপরাধ। আমি এই জঘন্য কাজে যোগ দেওয়ার চেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে মৃত্যুবরণ করাকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।' এরপরেই তিনি শান্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, বিজ্ঞানীদের কেবল গজদন্ত মিনারে বসে থাকলে চলবে না, মানুষের কল্যাণের জন্যও এগিয়ে আসতে হবে। মানবতার প্রশ্ন সর্বাগ্রে আসা উচিত। তিনি বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পারলেন যে, নতুন পৃথিবীর নতুন সমাজ—শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একান্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। ১৯২২ সালে আইনস্টাইন বুদ্ধিজীবীদের পরিচালিত 'International Committee on Intellectual Co-operation' এর সদস্য হন। কিন্তু কমিটির কতকগুলো বৈঠকে যোগ দিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে, সদস্যবৃন্দ যে যার নিজ নিজ স্বার্থের প্রতিই দৃষ্টি দিচ্ছেন। যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে, তা আন্তরিকভাবে কেউই মানছেন না। সেজন্য ১৯২৩ সালে তিনি এর সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

১৯৩৩ সাল। তখন জার্মানীতে হিটলারের ইহুদী নিধন যজ্ঞ চলছে। হিটলারের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য আইনস্টাইন জার্মানী থেকে পালিয়ে এসে বিভিন্ন দেশ ঘুরে অবশেষে আমেরিকায় আশ্রয় নিলেন এবং সেখানকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে লাগলেন। শেষ জীবনে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে উন্নীত হন এবং ঐ পদেই বাকি জীবনটুকু ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব পান।

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসের এক মর্মান্তিক দিন। তৎকালীন মার্কিন সরকারের নির্দেশে মার্কিন সামরিক বিমান থেকে সদ্যপ্রস্তুত একটি পরমাণু বোমা ফেলা হল জাপানী শহর হিরোসিমার উপর। পৃথিবীতে সেই প্রথম পরমাণু বোমার আবির্ভাব তথা ব্যবহার ঘটলো। এর ঠিক তিনদিন পরে, ৯ আগস্ট আর একটি জাপানী শহর নাগাসাকির উপর অনুরূপভাবে আর একটি পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করলো আমেরিকা। এই দুই মারণাস্ত্রের প্রভাবে এই দুই শহরের হাজার হাজার মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। অজস্র মানুষ অজানা রোগে আক্রান্ত হলেন। বোমা বিস্ফোরণের এই করাল ছায়া আইনস্টাইনকে ভীষণ মর্মাহত করল। মানবতার উপর এই জঘন্য আক্রমণের ঘটনায় গভীরভাবে ব্যথিত আইনস্টাইনের মর্মস্পর্শী মন্তব্য, 'আবার যদি নতুন করে জন্মাতে হয় তো বিজ্ঞানী হয়ে নয়, জন্মাতে চাই কামার, কুমোর বা ছুতোর হয়ে—যাতে করে চিন্তার, বাক্যের ও কর্মের স্বাধীনতা থাকে—শান্তি থাকে কর্মে ও মনে।' তাঁরই আবিষ্কৃত $E = mc^2$ সূত্রের প্রয়োগেই পরমাণু বোমার আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল—তাই অনেকেই তাঁকে পরমাণু বোমার জনক বলে চিহ্নিত করে তাঁর বিরূপ সমালোচনা করে। এ'জন্য এক চরম মানসিক যন্ত্রণা ও আত্মপীড়া সর্বদা অনুভব করতেন আইনস্টাইন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পড়া পর্যন্ত তা থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত হোক—ধ্বংসের কাজে নয়—এই ছিল আইনস্টাইনের কামনা।

আইনস্টাইন মনে-প্রাণে ছিলেন শান্তিকামী, ঘোরতরভাবে যুদ্ধবিরোধী। হিরোসিমা-নাগাসাকির এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীরভাবে শোকাহত আইনস্টাইন ঠিক করলেন, মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি অনেক কিছু করবেন। ভাবলেন, পৃথিবীর মানুষকে বোঝাতে হবে—পরমাণু- শক্তি শুধু ধ্বংসই করে না, মানুষের অশেষ কল্যাণসাধনেও একে কাজে লাগানো যেতে পারে। সমস্ত রাষ্ট্রের

কাছেও আবেদন রাখতে হবে যে, এই শক্তির ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাকে কেউ যেন যথেচ্ছ ব্যবহার না করে আয়ত্তাধীনে রাখে। কাগজ-পত্রে তাঁর বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগলো পরমাণু শক্তির মানবকল্যাণে সম্ভাব্য ব্যবহারের বিভিন্ন দিক নিয়ে। আইনস্টাইন চাইতেন, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংস্থা, যার হাতে থাকবে সমগ্র পৃথিবীর প্রশাসনিক ও বিচারক্ষমতা, আর সেই সংস্থার নাম হবে 'Supranational Organization' (অধিজাতীয় সংস্থা) বা 'Restricted World Government' (সীমিত বিশ্ব সরকার)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় দশমাস পরে রচিত এক রাজনৈতিক দার্শনিক প্রবন্ধে পরমাণু যুদ্ধের বিভীষিকায় আচ্ছন্ন আইনস্টাইন ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ এক ভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সকল মানুষের শান্তিতে বসবাস করার জন্য যা আবশ্যিক বলে তিনি মতামত দেন। এই প্রবন্ধে তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন—যুদ্ধ এবং শান্তির পরিকল্পনা একই সাথে করা যায় না।

মনে-প্রাণে শান্তিবাদী আইনস্টাইন একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে পৃথিবীতে শুধু যে শান্তি চাইতেন তা নয়, মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা ও ঘৃণা দেখলে কিংবা শুনলে তাঁর সংবেদনশীল মন বেদনার্ত হয়ে উঠত। এইসব অত্যাচার থেকে মানুষকে কীভাবে মুক্ত করা যায় সে ব্যাপারে তিনি সর্বদাই সচেষ্ট হতেন। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি বুদ্ধিজীবীদের একজোট করার চেষ্টায় নিরলসভাবে ব্রতী হন। তিনি বলেন, 'আমার শান্তিবাদ একটি সহজ প্রবৃত্তিজাত অনুভূতি। এই অনুভূতিতে আমি অভিভূত হই, কারণ মানুষকে হত্যা করা একটি নিদারুণ বিরক্তিকর ব্যাপার। আমার এই অনুভূতি কোন বুদ্ধিবাদ থেকে জন্মায়নি, কিন্তু এর ভিত্তি হল সর্বপ্রকার নিষ্ঠুরতা ও ঘৃণার প্রতি গভীর বিরূপতা।' ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রবল পরাক্রমশালী ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন আইনস্টাইনকে গান্ধীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল। তিনি গান্ধীজীকে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহী বলে মনে করতেন। তাঁর মত ছিল, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এটা বিশ্বাস করা কষ্টকর হবে যে, গান্ধীজীর মত একজন রক্তমাংসের মানুষ এই পৃথিবীতে একদিন হেঁটে-চলে বেড়িয়েছেন। আততায়ীর হাতে মহাত্মা গান্ধীর নিষ্ঠুরভাবে নিহত হওয়ার খবরে মর্মাহত আইনস্টাইন মন্তব্য করেন, 'ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বুঝবে না, বিশ্বশান্তির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কত বড় এক মহাপুরুষকে তারা হারিয়েছে।' প্রিন্সটনে আইনস্টাইনের পড়ার টেবিলের সামনে থাকতো গান্ধীজীর একখানি ফটো।

১৯৩৬ সালে স্ত্রীর মৃত্যুর পরে আইনস্টাইন মানসিকভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। ঠিকমতো সেবাযত্নের অভাবে ও প্রচণ্ড পরিশ্রমের ফলে এরপর থেকেই তিনি ঘনঘন অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন। কিন্তু তার মধ্যেও বিজ্ঞানের এই মহাসাধক তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি বিশ্বশান্তির পক্ষে জনমত সংগঠিত করার কাজে নিরলসভাবে প্রয়াসী হয়েছেন—নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর সেই স্বপ্নের পৃথিবী তৈরির চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হবে, যেখানে থাকবে না যুদ্ধ, হানাহানি, হিংসা, বিদ্বেষ, জাতপাত, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অশান্তি। একদিকে বিজ্ঞানে বিশ্বজনীন খ্যাতি, নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রতি অত্যুৎসাহী—অপরদিকে শান্তির জন্য ও আর্তের সেবার সর্বদাই এগিয়ে যাওয়া, প্রাণখোলা মন—একই ব্যক্তির মধ্যে সঙ্গীত ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন—এই অদ্ভুত বৈপরীত্যের সু-সমন্বয় দেখা যায় আইনস্টাইনের চরিত্রে। মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বেও একটি প্রচারপত্রে তিনি স্বাক্ষর করেন, বিশ্বশান্তির প্রয়োজনে সমস্ত রকম পারমাণবিক অস্ত্র, রাসায়নিক অস্ত্র ও অন্যান্য মারণাস্ত্র পরিত্যাগের জন্য সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছিল যাতে।

১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল বিশ্বশান্তি আন্দোলনের পুরোধা, কালজয়ী বিজ্ঞানী তথা বিশ্বনাগরিক আইনস্টাইনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকজ্ঞাপন করলেন বিশ্বের বহু মনীষী ও বিজ্ঞানী। শোকাচ্ছন্ন এক বন্ধু লিখলেন, 'এই মানুষটির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় হয়েছে, তাঁরা স্থির করতে পারবেন না যে, এই মানুষটির যে মস্তিষ্কের চিন্তায় বিশ্বের রূপ ধরা পড়েছে সেই মস্তিষ্কটিই বড়, না যে হৃদয়ে সঞ্চিত থাকতো সব মানুষের প্রতি ভালোবাসা—সেই হৃদয়টিই বড়।' বেদনাহত জওহরলাল নেহরুর একটি উক্তি স্মরণীয়—'ছায়ায় ঢেকে যখন পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে আসত, ড. আইনস্টাইন তখন ছিলেন আলোর সঙ্কেতের মত।'

শুধু বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নয়, আইনস্টাইনের মানবপ্রীতি ও বিশ্বমানবতা যুগে যুগে উদ্বেলিত করবে মানবসমাজকে। আজ গোটা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়া সাম্রাজ্যবাদ, মৌলবাদ তথা সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিরুদ্ধে বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় শান্তিবাদী মানুষ যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন—আইনস্টাইনের নীতি, আদর্শ, ভাবধারা সেই লড়াই-আন্দোলনের আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করছে, আন্দোলনের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে প্রেরণা জোগাচ্ছে। চিন্তন ও মননের অপূর্ব সমন্বয়ে অনবদ্য এই মহাবিজ্ঞানী বিংশ শতাব্দীর 'সেরা মানুষ' হিসাবে ঘোষিত হয়েছেন। তাঁর মত এক বিশাল হৃদয় ও বিশাল মস্তিষ্কের মহামানবকে এই সম্মান জানাতে পেরে মানবজাতি ধন্য হয়েছে। এই যুগাতীত মহামানব, বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানীকে সমগ্র পৃথিবী যুগ যুগ ধরে প্রণাম জানাবে—যতদিন সভ্যতা থাকবে। বিজ্ঞান আকাশের ধ্রুবতারা—বিশ্বশান্তি আন্দোলনের জনক এই মহাপুরুষকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

———

প্রবন্ধ

জীবনশৈলী বিষয়ে কয়েকটি কথা

সুরেশচন্দ্র পড়িয়া
প্রধান শিক্ষক, গোলাড় সুশীলা বিদ্যাপীঠ
মুখ্যসম্পন্ন ব্যক্তি - জীবনশৈলী শিক্ষা

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা স্তরে জীবনশৈলী বিষয়ক কর্মশালাগুলি পরিচালনা করছেন—যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত রায় (ডি.আই/এস. পশ্চিম মেদিনীপুর) ও শ্রদ্ধেয় অপরেশ ভট্টাচার্য (সদস্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ) এবং আবদুল হাই (এ.আই. খড়গপুর মহকুমা, কো-অর্ডিনেটর, জীবনশৈলী শিক্ষা)।

জীবনশৈলী বিষয়ক প্রতিটি কর্মশালাতে মোট ৫টি করে দল গঠন করা হচ্ছে। প্রতিটি দল প্রতিদিন লিখিতভাবে প্রতিবেদন জমা দিয়ে থাকেন। প্রতিবেদন লেখার বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

বিষয় ঃ (১) মাধ্যমিক শিক্ষার সময়কাল—বয়ঃসন্ধির শরীর, পরিবার-মানসিক ও সামাজিক বিকাশ ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষার সময়কালের সাথে বয়ঃসন্ধির শরীরের বেশ মিল দেখা যায়, কারণ বয়ঃসন্ধি আসে মূলতঃ মাধ্যমিক শিক্ষার সময়কালে—অর্থাৎ ১২ থেকে ১৯ বৎসর এর মধ্যে। এই সময়কালে একজন ছাত্র বা ছাত্রীর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নানান কারণে। মাধ্যমিক শিক্ষার একজন ছাত্র বা ছাত্রীর মধ্যে দেখা যায় শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক পরিবর্তন। এই সময়কালে শিক্ষার্থীকে নানান চাপের মুখে পড়তে হয়, ফলে কি পরিবারে, কি সমাজে তার সম্বন্ধে নানান ধারণার উদ্ভব হয়। নানান প্রশ্ন তার মনে ভিড় করে। সঠিক তথ্য কে তাকে দেবে? সে বিপথগামী হতে শুরু করে।

বয়ঃসন্ধির শরীর ঃ বয়ঃসন্ধিকালে আকস্মিক বৃদ্ধি ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ২ বছর আগেই হয়। হাতের তালু ও পায়ের পাতা প্রাপ্ত বয়স্কের মতো হয়। মেয়েদের নিতম্ব কাঁধের তুলনায় বেশি চওড়া হয়। চোয়াল, নাক বড় হয়। মুখগহ্বর চওড়া হয়। চিবুক সুস্পষ্ট হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে শৈশবের চর্বি ঝরে গিয়ে তারা কৃশ ও পেশিবহুল হয়। ছেলেমেয়েদের যৌনাঙ্গের পরিবর্ত্তন আসে—একে প্রাথমিক যৌন বৈশিষ্ট (Primary Sexual Symtom) বলে। পরবর্তীকালে নারীর স্তনের বিকাশ, পুরুষের মুখে গোঁফ-দাড়ি, বাহুমূলে ও শ্রোণীদেশে কেশোদগম দেখা যায়—একে গৌণ যৌন লক্ষণ বা Secondary Sexual Symtom বলা হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক ও সামাজিক বিকাশ ঃ

(ক) ছেলেমেয়েরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়।
(খ) সামান্য কারণে ছেলে মেয়েরা উত্তেজিত হয়ে যায়।
(গ) সমাজের বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত হতে চায়—পূজাপার্বণ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, চাঁদা সংগ্রহ, রক্তদান শিবির।
(ঘ) শরীর সম্পর্কে সজাগ থাকে—ঘন ঘন চুল আঁচড়ানো, নতুন ডিজাইনের পোষাক ব্যবহার।
(ঙ) বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েরা নিজেরা যেটা বোঝে—সেইটাকেই ঠিক মনে করে, সমাজের বা পরিবারের কারো মতামতকে গ্রহণ করতে পারে না।
(চ) অন্যকে নকল করতে ভালবাসে। নকল করে একজন শিক্ষক, একজন ডাক্তার, একজন সিনেমা আর্টিস্ট, গায়ক, বন্ধুদের কথাবার্তা।
(ছ) কল্পনা করতে ভালোবাসে।
(জ) বাবা-মার থেকে বন্ধুদের কথাবার্তা বেশি শোনে।

(২) জীবনশৈলী (সমাজ, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, স্বাস্থ্যচেতনা) ঃ জীবনশৈলী—শিক্ষার সাথে সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। জীবনশৈলী শিক্ষা আর যৌন শিক্ষা—এক বিষয় নয়। দুটি বিষয়ের আলোচ্যসূচি ও দৃষ্টিভঙ্গি পুরো আলাদা।

জীবনশৈলী ও সমাজ ঃ আজকের দিনে প্রায় সমস্ত পরিবারে সন্তানের সংখ্যা এক বা দুই। বাবা ও মা'র অন্ধ আদরে, বাইরের সমাজের সাথে তার পরিচয় করার অবকাশ থাকে না। জীবনশৈলী শিক্ষা চায়—ছেলেমেয়েদের মধ্যে সামাজিক বোধ, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণগুলির বিকাশ ঘটাতে। পরিবার থেকে আরম্ভ করে বৃহত্তর সমাজে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই অবহিত করতে হবে। বাবা-মা'র সাথে সন্তানের সম্পর্ক, শিক্ষক/শিক্ষিকার সাথে ছাত্রছাত্রীর সম্পর্ক, সমলিঙ্গ ও বিপরীত লিঙ্গের বন্ধুর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা ও তাকে মর্যাদা দেওয়ার শিক্ষা জীবনশৈলীর মাধ্যমেই আসে।

জীবনশৈলী ও সংস্কৃতি ঃ সমাজকে বোঝার সাথে সাথেই সমষ্টিগত জীবনযাপনের মানসিকতা তৈরী হয়। আর এখান থেকেই আসে শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ। জীবনশৈলী

শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই আগ্রহের সৃষ্টি করতে চায় সংস্কৃতির আস্বাদ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ—বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানুষের প্রতি সংবেদনশীল হতে এবং সুস্থ মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

জীবনশৈলী মূল্যবোধ ঃ শিক্ষার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যখন সামাজিকতা, সংস্কৃতিবোধ গড়ে ওঠে তখন তার মধ্যে জাগরিত হয় আর এক নতুন জগৎ—মূল্যবোধ। বর্তমানে মূল্যবোধ শব্দটির অর্থবিস্তার ঘটেছে। মূল্যবোধ বলতে বুঝি—সততা, সত্যবাদিতা, স্বার্থত্যাগ, মানসিক সম্পর্ক, দেশপ্রেম, বিবেকবোধ, দশজনকে একসাথে নিয়ে চলার মানসিকতা। প্রচলিত অমানবিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস জাগরিত করাই হল মূল্যবোধ। জীবনশৈলী শিক্ষা আর মূল্যবোধ সেই অর্থে সমার্থক।

জীবনশৈলী শিক্ষা ও স্বাস্থ্যচেতনা ঃ স্বাস্থ্যচেতনা বলতে বুঝি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে স্বাস্থ্যের যত্ন যেমন—(ক) বিশুদ্ধ পানীয় জল গ্রহণ করা, (খ) শৌচাগার ব্যবহার করা, (গ) প্রতিদিন বারে বেশি কিন্তু পরিমাণে কম কম খাদ্য গ্রহণ করা, (ঘ) কীটনাশক যুক্ত একেবারে টাটকা সব্জী না খাওয়া, (ঙ) কোল্ড ড্রিংক্স, মদ, সিগারেট সহ রাস্তার পাশে তৈরী করা খাবার না গ্রহণ করা, (চ) রঙিন জল, রঙিন মিষ্টি না কেনা, (ছ) খাদ্য তালিকায় সমস্ত রকম খাদ্য উপাদান-শর্করা, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, জল, খনিজ লবন অবশ্যই থাকবে। নিয়ম করে প্রত্যহ বেশি বেশি পরিমাণ জল খাওয়া অভ্যাস করতে হবে, (জ) প্রত্যহ স্নান করা, চোখ, হাত, দাঁতের ও যৌনাঙ্গের সঠিক যত্ন নিতে হবে। (ঝ) পোলিও, হাম, ডি পি টি—সঠিক সময়ে টিকাপ্রদান। জীবনশৈলী শিক্ষা কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই স্বাস্থ্যচেতনার সঞ্চার ঘটাতে সাহায্য করবে। সে কারণে জীবনশৈলী শিক্ষা আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক।

(৩) সহ পাঠক্রমরূপে জীবনশৈলী বিষয়গত শিখন প্রক্রিয়া ঃ যেহেতু জীবনশৈলী সহ পাঠ্যক্রমরূপে আসছে সে কারণে বিষয়টি শিখন প্রক্রিয়া মূলত অংশগ্রহণমূলক, যেমন—(ক) দলের মধ্যে আলোচনা, (খ) চিন্তার আলোড়নের পরিবেশ তৈরী করা, (গ) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, (ঘ) কল্প-নাটকাভিনয়, অর্থাৎ সংলাপ, নাচ, গান-এর মাধ্যমে, (ঙ) গল্পের মাধ্যমে, (চ) খেলার মাধ্যমে।

দলবদ্ধ সক্রিয়তা ঃ ছাত্রছাত্রীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করবে। তাদের দল তৈরীর স্বাধীনতা থাকবে। দল তৈরীর সময় কাউকে বিশেষ কারণে বাদ না দেওয়া তা লক্ষ্য রাখতে হবে। দলে সকলের আলোচনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। দলে কেউ একটু বেশি আবার কেউ একটু কম করবে এটা নিয়ে বিতর্ক না করা।

চিন্তার আলোড়ন ঃ

(১) সমসাময়িক কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সকলের মতামতকে গ্রাহ্য করতে হবে।

(২) ছেলেমেয়েদের মতামত ব্যাখ্যা করার জন্য চাপ দেওয়া যাবে না।

(৩) যেসব ছেলেমেয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে চায় না-তাদের উৎসাহিত করা।

প্রশ্নোত্তর ঃ বর্ত্তমানে এই পদ্ধতি খুবই প্রাসঙ্গিক। ছাত্রছাত্রীরা এতে আনন্দ পায়। এক প্রশ্ন থেকে অন্য প্রশ্নে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে। না হলে ছাত্রছাত্রীরা চিন্তার অবকাশ পায় না। ব্যক্তিগত প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর সেভাবেই দিতে হবে।

কল্পনাটক সংলাপ ঃ ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ের উপর ছোট ছোট নাটিকা করবে। ১৫-২০ মিনিট সময়ের মধ্যেও এসব করা যায়। যেমন—(ক) আমি-পরিবার-সমাজ। (খ) এড্‌স প্রতিরোধ ও এড্‌স আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা না করা সংক্রান্ত। (গ) মূল্যবোধ সম্বন্ধে। (ঘ) প্রচলিত কুসংস্কার সম্বন্ধে নাটিকা। কম সময়ের মধ্যে (১৫-২০ মিনিট) নাটক করতে হবে, কিন্তু যা ঘটল তার পর্যালোচনা গুরুত্ব সহকারে করতে হবে।

(৪) আত্মউপলব্ধি ঃ প্রেক্ষাপট-পরিবার ও সমাজ, ... রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' ও 'সমাপ্তি' গল্পের বিশ্লেষণ—

আত্ম-উপলব্ধি ঃ নিজেকে নিজে উপলব্ধি করার নামই হল আত্ম উপলব্ধি। আমি কে? কীভাবে এলাম? আমি কি করছি? আমার কাজে কারা সাহায্য করছে? আমি কি করবো? প্রথমে নিজেকে জানবে, চিনবে, তারপর পরিবারের লোকজনদের, তারপর সমাজ সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করবে। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নানান প্রশ্ন দেখা দেওয়ার সাথে সাথে আসে অতি উৎসাহ বা হতাশার ভাব। নিজেকে নিয়ে সংশয়, প্রশ্ন, কামনা-বাসনা জেগে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটেই তার পরিবারের যেমন ভূমিকা থাকবে—তেমনই ভূমিকা থাকবে সমাজের। পরিবারের উচিৎ নয় তাকে পড়াশুনায় ভালো রেজাল্টের জন্য আরো আরো চাপ দেওয়া। ছেলেমেয়ে যদি বিজ্ঞান শাখায় না পড়তে চায় তবে তাদের বেশি পীড়াপীড়ি করা উচিৎ নয়। সব কিছুকেই স্বাভাবিকভাবে নিতে হবে।

পুষ্টি ঃ যে পদ্ধতিতে জীব খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, শোষন, আত্তীকরণ ও অপাচ্য অংশের বহিঃষ্করণ করে সেই পদ্ধতিই হল পুষ্টি। আর যাহা জীবের দেহগঠন ও শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে তাহাই হল খাদ্য। এই খাদ্যের ৬টি উপাদান থাকে।

(ক) শর্করা—ভাত, আলু, চিড়ে, রুটি, ভুট্টা, চিনি, গুড়।

(খ) প্রোটিন—ছোলা, মুগ, মুসুর, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ।

(গ) ফ্যাট—ঘি, মাখন, মাংস, তেল, বাদাম, নারকেল, ডিমের কুসুম।

(ঘ) ভিটামিন—খাদ্যের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণে থাকে, যাহা নানান রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

(ঙ) জল—শরীরের খুব বেশি পরিমাণে জলের প্রয়োজন, সারাদিনে কম করে আড়াই লিটার।

(চ) খনিজ দ্রব্য—সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম (হাড়ের গঠন), আয়রন (রক্তাল্পতা), আয়োডিন।

<u>সমস্ত রকমের খাদ্য দিয়ে পুষ্টি পতাকা তৈরী করা যায় ঃ</u>

পতাকার গেরুয়া অংশ—কমলা লেবু, কলা, আম।

পতাকার সাদা অংশ—ভাত, রুটি, আলু, লবন, চিনি, মুড়ি।

পতাকার সবুজ অংশ—শাকসব্জী, লেবু।

পতাকার চক্র—তেল।

পতাকার দন্ড—জল।

পারস্পরিক সম্মানবোধ ঃ বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই ছেলেমেয়েরা যেমন অন্যকে সম্মান জানাতে চেষ্টা করে, অনুরূপে সেও চায় সম্মান। তাকে সামান্য কারণে কেউ ঘৃণা বা ছোট করলে সে অসম্মানিত বোধ করে। বয়ঃসন্ধিকালেই জাগরিত হয় আত্মউপলব্ধি, আত্মমর্যাদাবোধ। সে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে চায়।

মনোজগতের আলোড়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ বয়ঃসন্ধিকালের আত্মউপলব্ধি থেকে আসে মনজগতে নানান আলোড়ন, কখনও এই আলোড়ন উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে। আবার কখনও হতাশার। উচ্ছ্বাস, আবেগ, হতাশা থেকেই সে তার মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বন্ধুর মতামতকে গুরুত্ব দেয়। বাবা-মা-সমাজের অন্য অংশের মানুষের কথা তার মনঃপুত হয় না। ফলে মানব সম্পদ হারিয়ে যেতে বসে। জীবনশৈলী শিক্ষার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের রাস্তা আমাদেরই দেখিয়ে দিতে হবে।

'ছুটি' গল্প ঃ এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ ফটিক নামে বয়ঃসন্ধিকালে দাঁড়ানো একটি ছেলের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের দৃষ্টান্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ফটিক থাকে কলকাতায় মামার বাড়ীতে। সে একদিকে নিজের বাড়ীতে বাবা-মা'র স্নেহ থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে মামীর কটূক্তি তাঁকে বারে বারে আঘাত করেছে। বিশেষত, তেরো-চোদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নেই-ই। শোভাও ..... পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; ...... তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঃ (পয়েন্ট ২ এর 'জীবনশৈলী ও সংস্কৃতি' অংশে আলোচিত হয়েছে)।

মানসিক বিবর্তন ঃ 'বয়ঃসন্ধির শরীর ও বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক ও সামাজিক বিকাশ' অংশে আলোচিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য ঃ ২নং বিষয়ের 'জীবনশৈলী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য চেতনা' অংশে আলোচিত হয়েছে।

(৫) <u>বাড়ন্ত বয়স ঃ সুস্থ দেহ, সুস্থ মনের বিকাশ ... যৌথ সামাজিক সক্রিয়তা ঃ</u>

বাড়ন্ত বয়স ঃ কিশোর বয়স থেকে ধীরে ধীরে শরীর বেড়ে ওঠে, ভালোভাবে দেখলে বোঝা যাবে—

(ক) শারীরিক কোন কোন পরিবর্তন এল, কোন কোন বিষয়গুলি শৈশব দেহে ছিল না, কিন্তু কিশোর দেহে এসেছে।

(খ) মানসিক পরিবর্তন—শৈশব থেকে কিশোর দেহে, আত্মউপলব্ধি, আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মপ্রকাশ যা শৈশবে ছিল না, তা ধীরে ধীরে কিশোর দেহে ফিরে আসছে।

সুস্থ দেহ ঃ দেহের শারীরিক গঠন ও মানসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে দেহ কিভাবে সুস্থ থাকবে সে প্রশ্ন চলে আসে। এই সময়ের স্বাভাবিক শারীরিক ঘটনাবলী—মুখে ব্রণ বা দেহগন্ধ, আবার কিছু বয়সোচিত অভ্যাস বা সক্রিয়তা, যথা—নেশা বা হস্ত মৈথুন। কু-অভ্যাসটিকে সরাসরি ভালো বা মন্দ বলা ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে শিক্ষক বিষয়টির পক্ষে ও বিপক্ষে বক্তব্য তুলে ধরবেন মাত্র। কাউকে কোন বিষয়ে বাধ্য করা ঠিক নয়।

(ক) স্থূলতা ঃ বয়ঃসন্ধিকালের এটি একটি সমস্যা।

(খ) ব্রণ ঃ এর মূল কারণ সিবাম নামে তৈলজাতীয় পদার্থ যাহা সিবেসিয়াম গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। ব্রণ কখনই নখ দিয়ে খোঁটা ঠিক নয়। প্রতিদিন সাবান, গরম জল দিয়ে ধুলেই হবে।

(গ) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঃ ঋতুকালীন সময়ে মেয়েদের অবশ্যই পরিস্কার থাকতে হবে। অন্যথা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রামণ ঘটতে পারে। স্যানিটারী ন্যাপকিন বা প্যাড মাঝে মাঝে পাল্টানো উচিৎ।

(ঘ) নেশা ঃ এই বয়সে নেশার প্রতি একটা টান থাকে। নিজেকে জাহির করতে চায়। আলোচনা করতে হবে

(i) নেশার মাধ্যমে পুরুষত্ব প্রকাশ পায় না।

(ii) জীবন যন্ত্রনা লাঘব হয় না।

(iii) নেশা শারীরিক ক্ষতিকারক দিক—রক্তচাপ বৃদ্ধি, পাকস্থলীর রোগ, হৃৎপিন্ডের রোগ, অনিদ্রা, বদহজম।

(iv) স্মৃতি শক্তি কমিয়ে দেয়।

(v) সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

(vi) চাপ সহ্য করার ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়।

(vii) পর নির্ভর করে, আত্মবিশ্বাস কমে যায়।

মনের জানালা খুলে রাখা ঃ বাড়ন্ত বয়সের সাথে সাথে মনের জানালা খোলা রাখা উচিৎ। মনের গতি কোন পথে তা জানতে হবে। মনের জানালা খোলা রাখলে দেখা যাবে—(ক) আত্মনির্ভরতা ও স্বকীয় মানসিকতার বিকাশ। (খ) বড় কিছু কাজের দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছা। (গ) আবেগ ও কল্পনা প্রবণতা। (ঘ) বীরপূজা—নেতৃত্বদানের ইচ্ছা। (ঙ) গোষ্ঠীবদ্ধতা ও গোপনীয়তা এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ।

(ক) স্বকীয়তা ঃ একজন ছেলে বা মেয়েকে উন্নাসিক করে তুলতে পারে।

(খ) কল্পনাপ্রবণতা ঃ মানুষকে বাস্তববোধহীন অসামাজিক জীবে পরিণত করতে পারে।

(গ) বীরপূজা ঃ একজন গুণমুগ্ধ ব্যক্তিকে বিপদের সম্মুখীন ও অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত করতেপারে।

(ঘ) গোষ্ঠীবদ্ধতা ও গোপনীয়তা ঃ জন্ম দিতে পারে সংগঠিত অপরাধের।

(ঙ) বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ঃ ইভটিজিং থেকে শুরু করে ধর্ষণ পর্যন্ত করতে পারে।

উপরিউক্ত সমস্ত অপরাধগুলি থেকে বাড়ন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের রক্ষা করা যায় যদি তাদের মধ্যে জীবনশৈলী শিক্ষার মাধ্যমে মনের জানালা খোলা রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে।

জানতে শেখা, করতে শেখা ঃ বাড়ন্ত বয়সে সঠিক কোনটা, বেঠিক কোনটা তা জানতে হবে। এই জানা ও করার ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকার ভূমিকা অপরিহার্য—He is the friend, philosopher and guide.

দলবদ্ধ যৌথ সামাজিক সক্রিয়তা ঃ এককভাবে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। যৌথভাবে অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক সক্রিয়তা সৃষ্টি করতে হবে—সরাসরি ভুল বা ঠিক না বলে। আলোচনা, ভূমিকা পালন, নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের এ সম্পর্কে অবহিত করাতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য, মানসিক বিকার সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে।

(৬) (ক) <u>চেতনার রঙে রাঙাও সমাজ ঃ</u>

বয়ঃসন্ধিকালের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা টান বা আকর্ষণ থাকেই; বিশেষত বিপরীত লিঙ্গের প্রতি। ছেলেরা চায় মেয়েদের কাছে আকর্ষণীয় হতে আবার মেয়েরাও চায় ছেলেদের কাছে আকর্ষণীয় হতে। কোন কোন ছেলেমেয়ে ঠিক সময়ে বন্ধুদের 'না' বলার মতো দক্ষতা দেখাতে পারে না। তখনই শুরু হয় অর্ন্তদ্বন্দ্ব। এই বিরোধ থাকা সত্ত্বেও একজন বন্ধু অন্যের অনুরোধ ঠেলতে পারে না।

এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে—চাপের মুখে কিভাবে রুখে দাঁড়াবে?

(ক) বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে দৃঢ়চেতা হতে হবে, সরাসরি না বলার অভ্যাস করতে হবে, না হলে অন্য কোনভাবে এড়িয়ে যেতে হবে।

(খ) যৌন সংসর্গ না করে বিভিন্ন উপায়ে ভালোবাসা প্রদর্শনের পথ জানতে হবে।

(গ) প্রাত্যহিক জীবনে নানান প্ররোচনা আসবে, যতটা সম্ভব তার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

(৬) (খ) <u>সমাজ বিকাশের প্রগতির ধারায় ব্যক্তি মানুষের সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠার জীবনশৈলী ঃ</u>

বিশ্বায়নের দাপটে যে শিকড়বিহীন সংস্কৃতির প্রবাহ আমাদের গ্রাস করতে চলেছে, আমাদের জীবনচর্চাকে চালিত করতে চাইছে—তার থেকে সমাজ নামক শিশুটিকে রক্ষা প্রায় অসম্ভব। গণমাধ্যমের শক্তিশালী অংশ এই অসুস্থ প্রবণতাকে গ্রামে শহরে ছড়িয়ে দিচ্ছে। অবাস্তব এক রঙিন স্বপ্নের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। নির্বিচারে যৌন নির্যাতন, নারী নির্যাতন চলছে। ছেলেমেয়ের জীবনের একান্ত গোপনীয় মাধুর্যকে হাটের ভোগ্য পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে। মারাত্মক ড্রাগের নেশা, অবাঞ্ছিত গর্ভসঞ্চার, সর্বোপরি কালব্যাধি এইড্‌স-এর দ্রুত বিস্তার আমাদের আতঙ্কিত করে তুলছে। অনেক মানুষই এখন পুরানো চিন্তা ও অভ্যাস ঝেড়ে ফেলে সমাজ বিকাশের ধারাকে মেনে এগিয়ে যেতে চাইছেন। বিতর্ক থাকবে, প্রয়োগ-পদ্ধতি পৃথক হতে পারে, কিন্তু বিষয়টিকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমাদের পৌঁছে দিতেই হবে। নইলে সমাজ বিকাশের প্রগতির ধারা হঠাৎ থমকে যাবে। ব্যক্তি মানুষ একক ব্যক্তির মধ্যেই আবদ্ধ থাকবেন। সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠা তার পক্ষে আর সম্ভব হবে না।

'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া' — উক্তিটি অতীব প্রাসঙ্গিক এক্ষেত্রে। ব্যক্তি মানুষ, সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠার সার্থকতা—'আপনার লয়ে বিব্রত রহিতে / আসে নাই কেহ অবনী পরে / সকলের তরে সকলে আমরা / প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। জীবনশৈলী শিক্ষা আমাদের এই শিক্ষাই দেয়—জীবনশৈলীর শিক্ষা ব্যক্তি মানুষকে সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠার রাস্তা দেখায়। সমাজের যা কিছু ভালো তার সাথে যুক্ত হওয়ার কথা বলে। যা কিছু অন্যায় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ঢেউ তুলতে সাহায্য করে। জীবনশৈলী শিক্ষা আমাদের শেখায় 'স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে'।

(৭) <u>সবার উপরে মানুষ সত্য—একসঙ্গে বাঁচতে শেখা এবং হয়ে ওঠা ঃ</u>

(ক) জীবনশৈলী শিক্ষার আলোচনার মধ্যে জাতিগত বা লিঙ্গগত বৈষম্যের (ছাত্র-ছাত্রীদের বেঝাতে হবে মানুষ জন্মের সঙ্গে জাত-পাত নিয়ে আসে না। জাতের বজ্জাতি মানুষের সৃষ্টি) প্রসঙ্গ একেবারে বাদ দিয়ে পরস্পরকে ভালোবেসে এই পৃথিবীকে প্রীতিপ্রেমের আনন্দ নিকেতন কিভাবে তৈরী করা যায় তার সুচিন্তিত পন্থা-পদ্ধতি শিক্ষক মহাশয়গণ উদ্ভাবন করবেন।

আমাদের প্রচলিত সামাজিক ও পারিবারিক ধ্যান-ধারণা আছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার তারতম্য আছে। ঐ ধ্যান-ধারণা শিক্ষক মহাশয়গণ সুকৌশলে দূরীভূত করার চেষ্টা করবেন।

এমন কোন কথাবার্তা বা নির্দেশ তিনি শ্রেণী কক্ষে উপস্থাপিত করবেন না যাতে ছাত্রীরা হীনমন্যতায় ভোগে। পরন্তু শিক্ষা-দীক্ষায় এবং বিজ্ঞান ও কৃষ্টি জগতে যে মেয়েরা ছেলেদের সমান, তার উদাহরণ তুলে ধরার চেষ্টা করবেন।

(খ) এক কথায় শিক্ষকমহাশয় তাঁর আচরণ, উপস্থিত বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার প্রয়োগে ছাত্র-ছাত্রীদের মনের মন্দিরে মনুষ্যত্ব, বিবেক ও ভালোবাসার সহমর্মিতার ও সহানুভূতির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন।

উদাহরণ কথাবার্তা ও গল্পচ্ছলে শিক্ষকমহাশয়গণ বয়ঃসন্ধিকালীন Emotional Spirit কাজে লাগিয়ে যৌথভাবে বা দলগতভাবে সামাজিক কাজের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রামকে তথা দেশকে এবং দেশের মানুষকে ভালোবাসার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে সচেষ্ট হবেন।

উদাহরণ ঃ ঘরে আগুন লাগলে নেভানো, এলাকার নোংরা পরিস্কার করা, রক্তদান শিবির পরিচালনা, বধূ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, ঘরে ঘরে শৌচাগারের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো, সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জন-সাধারণকে সচেতন করা, মেলায় জলদান ও অনুসন্ধান অফিস চালানো ইত্যাদি।

(গ) বয়ঃসন্ধির ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনশৈলী শিক্ষা দানের মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করবেন সংসারের গুরুজনের কাছে তাদের দায়বদ্ধতা। পরিবারের বড়রা ছেলে-মেয়েদের মঙ্গলের জন্য সর্বক্ষণ সচেষ্ট, সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের কাছে তার দায়বদ্ধতা। যেমন—কৃষক কষ্ট করে খাদ্য উৎপাদন করে, গোয়ালা দুধ এনে আমাদের পুষ্টি জোগায়, নাপিত আমাদের ক্ষৌরকর্ম করছে, দরজি জামা বানাচ্ছে, মেথর মল, ময়লা পরিস্কার করে আমাদের পরিবেশকে সুন্দর করে রাখছে এরা সবাই সমাজবন্ধু। এরা সবার উপকারী, এদেরকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। এদের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ানো উচিৎ। এদের আপন করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েদের পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করতে হবে।

শুধু মানুষ নয়, আমাদের পরিবেশে উদ্ভিদ, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ যারা আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে তাদেরকে আপন করে নেওয়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে।

(ঘ) ছেলেমেয়েদের মনে এই ধারণা জাগাতে হবে যে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একক মানুষ অনেকক্ষেত্রেই ভয়ঙ্কর এবং নিরর্থক। সুতরাং সমবায়ী মনোভঙ্গী গড়ে তুলে ছাত্র-ছাত্রীদের মন থেকে আত্মকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে সমষ্টির ভাবনা জাগিয়ে এক পূর্ণ কুসংস্কারমুক্ত সুস্থ সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

সর্বোপরি শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে কুসংস্কারমুক্ত চিন্তার অধিকারী হয়ে আচার আচরণে, কথাবার্তার মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিজ্ঞান চিন্তার প্রভাব ফেলতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে তারা মানুষ হয়ে ওঠার পথে কোন বাধা না পায়। কারণ তারাই ভবিষ্যত। সুস্থ সমাজের আদর্শ নাগরিক। অগ্রগামী চিন্তার ধারক বাহক এবং পরিচালক। বর্তমান পৃথিবীর প্রতিরোধের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে বিশ্বায়নের প্রবক্তারা যুবসমাজকে আকণ্ঠ ভোগবাদে নিমজ্জিত রাখার কৌশল নিয়েছে। শৈশব থেকেই তাদের আত্মকেন্দ্রিক ও বিকৃত মানসিকতা গড়ে তুলতে কাজে লাগাচ্ছে মিডিয়াকে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাদের যুবসমাজ আপন বেগে খরস্রোতা নদীর মতো এগিয়ে যাবে, লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে জীবনশৈলীকে সাথে নিয়ে।

বিষয়গুলি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। পরিবেশ ও পরিস্থিতি মতো বিষয়গুলির প্রয়োজনীয় যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও আলোচনা আপনাদের করে নিতে অনুরোধ করছি।

পরিশেষে যে কথা বলতে চাই — 'জীবনশৈলী শিক্ষা' আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রশ্নে কৌশলগত পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু নীতিগত কোনো পার্থক্য নেই। কারণ এই শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে তাদের কাছে অবশ্যই পৌঁছে দিতে হবে। গত ১২ই অক্টোবর হইতে ১৪ই অক্টোবর ২০০৬ পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম মহকুমার ৮টি সারকেলের সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে এই কর্মশালা করা সম্ভব হয়েছে। প্রতি বিদ্যালয় থেকে প্রধান শিক্ষক সহ ৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেছেন। কর্মশালা আরম্ভের পূর্বে এর সাফল্য সম্পর্কে আমাদের মধ্যেও কিছুটা আশঙ্কা ছিল। কারণ বিষয়টির মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব আছে। সর্বোপরি অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ কিভাবে নেবেন এই কর্মশালার আলোচ্য বিষয়বস্তুকে, সেখানেও কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল। কিন্তু সমস্ত আশঙ্কা, উদ্বেগকে ভুল প্রমাণ করে ৮টি সার্কেলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সাগ্রহে এগিয়ে এসেছেন। আন্তরিকতার সাথে ৩ দিন ধরে জীবনশৈলী বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং কিভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খেলাধুলার মাধ্যমে অতি সহজেই পৌঁছে দেওয়া যায় তার পথ অনুসন্ধান করেন। বেশ কিছু অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন—যেমন বিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে পরিচালন সমিতির সম্পাদক ও সভাপতিকে এই কর্মশালার সাথে যুক্ত করলে বিদ্যালয় স্তরে জীবনশৈলীকে আরও সহজে নিয়ে যাওয়া যেত। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ জীবনশৈলী বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয় স্তরে আন্তরিকভাবে কাজ করবেন তা এই কর্মশালাগুলি থেকে বোঝা গেছে।

● সদর মহকুমা ●

১। **সদস্য সংগ্রহ ঃ** আমাদের প্রিয় সমিতি ২০০৬-০৭ বর্ষে সদস্যপদ পুনঃনবীকরণের পক্ষকাল ৫ মে থেকে ১৯ মে পর্যন্ত ধার্য করেছিল। এই পক্ষকালের মধ্যে ২০৮৪টি সদস্যপদ জমা পড়েছিল। লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৪১০। মহকুমার ৭টি আঞ্চলিক শাখাই লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। জেলার মাধ্যমে রাজ্যে জমা পড়েছে ব্যক্তিগত ৪৬, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে ২৫১৮টি। মোট জমা পড়েছে ২৫৬৪টি।

২। **চতুর্দশ বিধানসভা নির্বাচন ঃ** কেরালা, আসাম, পণ্ডিচেরি ও তামিলনাড়ুতেও পশ্চিমবঙ্গের সাথে নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়েছিল। ২৩৪ আসনবিশিষ্ট তামিলনাড়ুতে একদিনেই অর্থাৎ ৮ মে নির্বাচন হয়। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হয় ৫ দফায়। দলে দলে পর্যবেক্ষক প্রেরণ, ভোটারদের হুমকি, নির্বাচনের সাথে যুক্ত স্থানীয় অফিসারদের ও কর্মচারীদের ধমক, নির্বিচারে 'ভোটার লিষ্ট থেকে নাম কেটে দেওয়া, রেশনকার্ড বা ফটো পরিচয়পত্রকেও উপেক্ষা করা, কাউকে বাংলাদেশী বলে, কাউকে জাল ভোটার বলে এবং জীবিতকেও মৃত ঘোষণা করে বেপরোয়াভাবে লিষ্ট থেকে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার মোচ্ছব শুরু হয়ে গেল নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুদ্ধিকরণের নামে। রাজ্যে বিরোধী দলগুলি, কিছু বুদ্ধিজীবী ও সংবাদ মাধ্যম প্রবল উৎসাহে নাম কাটার দক্ষযজ্ঞকে সমর্থন করল। বুথে বুথে আধা সামরিক বাহিনীর লোকজন এল। নির্বাচনী পোষ্টার, ব্যানার প্রভৃতি নিষিদ্ধ হল, কিন্তু তামিলনাড়ুতে সবই চালু থাকল। এ সবের পরেও দেখা গেল, সপ্তমবারের জন্য বামফ্রন্ট ৩/৪-এর থেকেও বেশী আসনে জয়ী হল। প্রাপ্ত ভোট শতাংশের বিচারে ৫০ শতাংশকে ছাড়িয়ে গেল। এই রাজ্যে রাজনীতির যে বিকাশ ঘটেছে তাতে শক্তিশালী হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ। কোণঠাসা হল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলা বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সমস্যা সমাধানে চিরদিনই অগ্রণী থাকবে—এই আশা করি।

৩। ২১.০৫.০৬ তারিখ জেলার নব-নির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে বিজয় মিছিলের সূচনা করেন জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অধ্যাপক দীপক সরকার। ট্যাবলো সহ বিশাল মিছিল মেদিনীপুর শহর পরিক্রমা করে। সমিতির ট্যাবলোর পিছনে ৫৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

৪। ২১.০৬.০৬ তারিখ বামফ্রন্ট সরকারের ৩০ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে পঞ্চায়েত সমিতিগতভাবে সভা হয়েছে জেলাজুড়ে। এই সভাগুলিতে সমিতির সদস্যবন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন।

৫। ১২.০৭.০৬ তারিখ ১২ই জুলাই কমিটির ৪০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভা জেলায় হয়েছিল। সদর মহকুমার প্রত্যেক ব্লকেও এই অনুষ্ঠান হয়েছিল।

৬। ২০.০৭.০৬ তারিখ সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরে বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে মহোদয়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনজন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য যান নি।

৭। সদর মহকুমার ৭টি আঞ্চলিক শাখার ১৬১টি ইউনিটের মধ্যে গোয়ালতোড়ের ১৮টি ইউনিটের ২টিতে এবং গড়বেতার ২২টি ইউনিটের মধ্যে ৪টিতে বার্ষিক সাধারণ সভা হয়নি। বাকী ১৫৫টি ইউনিটেই এ.জি.এম. হয়েছে নিয়ম মেনেই।

৮। ০৫.০৮.০৬ তারিখ জেলা দপ্তরে মেদিনীপুর গ্রামীণ আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা সমিতির পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। শুরুতে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সহ-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ দত্ত উদ্বোধন করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর কয়েকজনের আলোচনা শুনে জেলার সহ-সম্পাদক অশোক ঘোষ গঠনমূলক বক্তব্য রাখেন। ২৪টি ইউনিটের আলোচনা শুনে সদর মহকুমা সম্পাদক সুবীরকুমার সিংহ সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সাংগঠনিক বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন ৭০ জন।

৯। ০৫.০৮.০৬ তারিখ মেদিনীপুর শহর আঞ্চলিক শাখার এ.জি.এম. অনুষ্ঠিত হয় মোহনানন্দ বিদ্যামন্দিরে। সমিতির পতাকা উত্তোলনের পর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। সাধারণ সভার উদ্বোধন করেন জেলার সহ-সম্পাদক অশোক মণ্ডল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর সদস্যগণের আলোচনা শুনে জেলা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অপরেশ ভট্টাচার্য তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন। সভায় উপস্থিতি ২২৫ জন।

১০। ০৬.০৮.০৬ তারিখ গোয়ালতোড় আঞ্চলিক শাখার এ.জি.এম. হয় হুমগড় চাঁদাবিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে। সমিতির পতাকা উত্তোলন ও এস.এস.সি. থেকে আগত বন্ধুদের সম্বর্ধিত করা হয়। এ.জি.এম. সভার উদ্বোধন করেন মহকুমা শাখার সভানেত্রী বাসন্তী

ভট্টাচার্য। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ১৮টি ইউনিট থেকে ১৪ জন আলোচনা করেন। মহকুমা নেতৃত্ব শিশির ত্রিপাঠী, নির্মল প্রামাণিক ও প্রাইমারী কাউন্সিলের সভাপতি ব্রজগোপাল পড়িয়া বক্তব্য রাখেন। আলোচকদের বক্তব্য শুনে মহকুমা সম্পাদক সুবীরকুমার সিংহ সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সাংগঠনিক বক্তব্য রাখেন। সভায় উপস্থিতি ১০৫ জন।

১১। ০৮.০৮.০৬ তারিখ শালবনী আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ভাদুতলা হাইস্কুলে। সমিতির পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সভার সূচনা হয়। ২৫টি ইউনিট থেকে মোট ১৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। নির্মল প্রামাণিক, ব্রজগোপাল পড়িয়া উপস্থিত ছিলেন। জেলা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অপরেশ ভট্টাচার্য সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচকদের বক্তব্য শুনে তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে সাংগঠনিক চিত্রসহ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন। সভায় উপস্থিত সকলে তাঁর বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আগামীদিনে সঠিক পথে সংগঠন পরিচালনার অঙ্গীকার করেন। সদর মহকুমা সম্পাদক সুবীর সিংহ আগামীদিনের কর্মসূচি ও সংগঠন সম্পর্কে বলেন।

১২। ০৯.০৮.০৬ তারিখ গড়বেতা আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা সকাল ৯টায় ধোবাবেড়িয়া হাইস্কুলে সমিতির পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। সভায় ২২টি ইউনিট থেকে ১৬৭ জন উপস্থিত ছিলেন। বাসন্তী ভট্টাচার্য উদ্বোধন করেন। ১৪ জন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। জেলা সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্যে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন। সাধারণ সভায় মহকুমা সম্পাদক ব্রজগোপাল পড়িয়া, নির্মল প্রামাণিক উপস্থিত ছিলেন।

১৩। ০৯.০৮.০৬ তারিখ দুপুর ২টায় চন্দ্রকোনা রোড আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা ডাবচা নবকোলা হাইস্কুলে সমিতির পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন আঞ্চলিক শাখার সভাপতি সুবীর সিংহ। সভার উদ্বোধন করেন জেলা শাখার সহ-সভাপতি গদাধর বারিক। ১৮টি আঞ্চলিক শাখা থেকে মোট ১২৪ জন উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ১৬ জন আলোচনা করেন। জেলা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অপরেশ ভট্টাচার্য আলোচকদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সুন্দর ও সহজভাবে ব্যাখ্যা করেন। সাংগঠনিক বক্তব্যে সবাই অনুপ্রাণিত হন।

১৪। ২৬.০৮.০৬ তারিখ কেশপুর আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা কেশপুর অডিটোরিয়াম হলে দুপুর ২টায় সমিতির পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। ৪০টি আঞ্চলিক শাখা থেকে মোট ৪৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন করেন প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ব্রজগোপাল পড়িয়া। মহকুমা শাখার সভানেত্রী বাসন্তী ভট্টাচার্য সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর সদস্যগণ সাব-জোনভিত্তিক আলোচনা করেন। মহকুমা সম্পাদক সুবীর সিংহ সংগঠন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রাখেন। গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রদ্ধেয় তরুণ রায় তাঁর সুন্দর ও সাবলীল বক্তব্যে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন। সবশেষে জেলা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অপরেশ ভট্টাচার্য দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। সবাই তাঁর বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অভিনন্দিত করেন।

১৫। ১২.০৮.০৬ তারিখ এস.টি.এফ.আই.-এর প্রতিষ্ঠা দিবসকে দাবী দিবস হিসাবে পালন করা হয় ব্যাজ ধারণ করে জেলার কর্মচারী ভবনের সভাকক্ষে। পাতাকা উত্তোলন করেন এস.টি.এফ.আই.-এর প্রাক্তন নেতৃত্ব নেপাল ঘোষ। হলভর্তি ঘরে প্রধান বক্তা ছিলেন এস.টি.এফ.আই.-এর প্রাক্তন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় তুষারকান্তি পঞ্চানন।

১৬। ১৩.০৮.০৬ তারিখ সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরে মাদ্রাসা শিক্ষা কনভেনশনে সদর মহকুমার ৮টি মাদ্রাসা থেকে মোট ৭ জন গিয়েছিলেন। কেশপুরের ৩ জন, মেদিনীপুর গ্রামীণ আঞ্চলিক শাখার ১ জন, মেদিনীপুর শহর আঞ্চলিক শাখার ২ জন এবং চন্দ্রকোনা রোডের ১ জন। মহকুমার দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই সহ-সম্পাদক মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ও নির্মল প্রামাণিক ঐ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। অনুষ্ঠানে মাদ্রাসা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আবদুস সাত্তার মহাশয়কে সম্বর্ধিত করা হয়।

১৭। ১৭.০৮.০৬ তারিখ ৮০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত কেন্দ্রের কাছে দাবী ও রাজ্যের কাছে দাবী আদায়ের নিমিত্তে D.I. (S.E.) দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ ও অবস্থানে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে মোট ৯৩৩ জন উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্পাদক সুবীরকুমার সিংহ ঐ সমাবেশে D.I. মহোদয়কে দেয় ডেপুটেশনের লিখিত বয়ান পড়েন। মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলী D.I.-কে ডেপুটেশন দেন। D.I. (S.E.) মহোদয় সভায় এসে দাবীগুলি পূরণের আশ্বাস দেন। সভায় জেলা শাখার সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য ও সহ-সম্পাদক অশোক ঘোষ উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভানেত্রী সভার কাজ শেষ করেন।

১৮। ২৭.০৮.০৬ তারিখ সমিতি নির্দেশিকা অনুযায়ী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে (বালক) অনুষ্ঠিত হয়। সাতটি আঞ্চলিক শাখা থেকেই প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেছিল।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

গোলকপতি ভবন

রবীন্দ্রনগর মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর

দূরভাষ ঃ ০৩২২২-২৭৫২৬৮

বিদ্যালয় ভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ফলাফল

আবৃত্তি

'ক' বিভাগ—রিয়াসী পলমল — গড়বেতা উমাদেবী বালিকা বিদ্যালয়

'খ' বিভাগ—আম্রপালি গোস্বামী — রামকৃষ্ণ সারদাপীঠ

'গ' বিভাগ—রূপা মণ্ডল — সুভাষপল্লী জনকল্যাণ বালিকা বিদ্যালয়

'ঘ' বিভাগ—দেবরূপা রায় — রামকৃষ্ণ সারদাপীঠ

হিন্দি কবিতা

'ক' বিভাগ—প্রিয়াঙ্কা দাস — অলিগঞ্জ ঋষি রাজনারায়ণ বালিকা বিদ্যালয়

'খ' বিভাগ—শাওন চ্যাটার্জী — অলিগঞ্জ ঋষি রাজনারায়ণ বালিকা বিদ্যালয়

উর্দু কবিতা

'ক' বিভাগ—নার্গিস খাতুন — নয়াবসান জনকল্যাণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

'খ' বিভাগ—মেহেবুব আলম — কেশপুর এল. এন. উচ্চ বিদ্যালয়

সঙ্গীত

'ক' বিভাগ—রিয়া মাইতি — বড়মোহনপুর সীতাংশু বালিকা বিদ্যালয়

'খ' বিভাগ—তিথি রানা — রামকৃষ্ণ সারদাপীঠ

'গ' বিভাগ—অর্ঘ বিশাল — চন্দ্রকোনা জিরাট উচ্চ বিদ্যালয়

'ঘ' বিভাগ—গায়ত্রী দে — খড়্গপুর সিলভার জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়

সমবেত সঙ্গীত

খড়্গপুর ট্রাফিক স্কুল—

১। মিঠু রায়চৌধুরী
২। সুস্মিতা দত্ত
৩। জলি দত্ত
৪। অরিজিৎ মুখার্জী
৫। অরিজিৎ মুখার্জী
৬। সাবিনা খাতুন
৭। শুক্লা ব্যানার্জী

গল্প বলা

ঈশিতা ঘোড়ই—রথিপুর বরদা বাণীপীঠ

নির্বাচিত গদ্যাংশ পাঠ

সায়ক বসু—খড়্গপুর সিলভার জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়

তাৎক্ষণিক বক্তৃতা

'ক' বিভাগ—পৌলমী মণ্ডল — অলিগঞ্জ ঋষি রাজনারায়ণ বালিকা বিদ্যালয়

'খ' বিভাগ—তন্ময় গোস্বামী — নন্দনপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়

বসে আঁকো

'ক' বিভাগ—নালক ভট্টাচার্য — মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল

'খ' বিভাগ—গৌতম বেরা — মোহনপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়

প্রবন্ধ রচনা

ছাত্র-ছাত্রী—আবিরময় ঘোষ — ক্ষীরপাই উচ্চ বিদ্যালয়

শিক্ষক-শিক্ষিকা—গৌতম বেরা — ক্ষীরপাই ডাঃ এস. কে. বর্মণ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

শিক্ষকর্মী—নিত্যরঞ্জন ঘোষ — চন্দ্রকোনা জিরাট উচ্চ বিদ্যালয়

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

গোলকপতি ভবন

রবীন্দ্রনগর মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর

দূরভাষ ঃ ০৩২২২-২৭৫২৬৮

আগামী কর্মসূচি

(ক) আগস্ট, ২০০৬-এর মধ্যে ২০০৬-০৭ বর্ষের সদস্য সংগ্রহের কাজ শেষ করতে হবে।

(খ) প্রতিটি বিদ্যালয় ইউনিটে একাধিক 'শিক্ষা ও সাহিত্য' ও জেলা বুলেটিন 'আহ্বান'-এর গ্রাহক সংগ্রহের কাজ শেষ করতে হবে।

(গ) ২০ জুলাই-এর মধ্যে বিদ্যালয় ইউনিট স্তরে বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ শেষ করতে হবে।

(ঘ) ১৫ আগস্ট-এর মধ্যে আঞ্চলিক শাখাস্তরে বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ শেষ করতে হবে।

● উভয়ক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সমিতির নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রস্তুত করতে হবে।

(ঙ) ৩১ জুলাই, ২০০৬-এর মধ্যে ইউনিট স্তরের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষ করতে হবে।

(চ) ৩০ আগস্ট, ২০০৬-এর মধ্যে মহকুমা স্তরের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষ করতে হবে।

(ছ) ১০ সেপ্টেম্বর, ২০০৬-এর মধ্যে জেলাস্তরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

● সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু সম্বলিত বুলেটিন ও পোষ্টার মহকুমায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আঞ্চলিক শাখাগুলি সংশ্লিষ্ট মহকুমা দপ্তর থেকে এই বুলেটিন সংগ্রহ করুন।

(জ) আগামী ২০ জুলাই সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর সত্যপ্রিয় ভবনে বেলা ২টায় নবনিযুক্ত বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় পার্থ দে মহাশয়কে সমিতির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই কর্মসূচিতে মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দকে উপস্থিত থাকতে হবে। জেলা কেন্দ্র থেকে একটি বাস ছাড়বে। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা সকাল ১০টার মধ্যে জেলা কেন্দ্রে রিপোর্ট করবেন।

(ঝ) ১২ জুলাই, '০৬ '১২ই জুলাই কমিটির' প্রতিষ্ঠা দিবস জেলা মহকুমা ও ব্লক স্তর পর্যন্ত পালন হবে। জেলা সমিতি, মহকুমা ও আঞ্চলিক শাখার নেতৃবৃন্দ সংশ্লিষ্ট স্তরের সাথে যোগাযোগ করে ঐ কর্মসূচিতে সদস্যদের অংশগ্রহণ করানোর উদ্যোগ নেবেন।

(ঞ) আগামী ১২ আগস্ট STFI-এর প্রতিষ্ঠা দিবস জেলা কেন্দ্রে পালন করা হবে। STFI-এর পতাকা উত্তোলন ও একটি আলোচনা সভার মাধ্যমে এই কর্মসূচি পালিত হবে। মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে বেলা ২টায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। নিম্নে মহকুমা ভিত্তিক ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হল ঃ

খড়্গপুর—	৩০০ জন	ঘাটাল—	১০০ জন
সদর—	২০০ জন	ঝাড়গ্রাম—	৫০ জন

● জেলা কাউন্সিল সদস্য ও মহকুমা কমিটির সদস্যদের এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

(ট) ১৩ আগস্ট, ২০০৬ সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর সত্যপ্রিয় ভবনে মাদ্রাসা শিক্ষকদের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। এই কনভেনশনে মাদ্রাসা ও সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী ড. আবদুল সাত্তার বক্তব্য রাখবেন। সভায় তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। আমাদের জেলা থেকে কমপক্ষে ১০০ জন মাদ্রাসা শিক্ষককে উপস্থিত করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(ঠ) নিম্নলিখিত তারিখগুলিতে মহকুমাভিত্তিক অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মাধ্যমিক দপ্তরে / সদর মহকুমার ক্ষেত্রে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মাধ্যমিক দপ্তরে সমাবেশ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে।

মহকুমার নাম	তারিখ	সময়	স্থান
সদর মহকুমা	১৭ আগস্ট, ২০০৬	দুপুর ১টা	জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তর, মেদিনীপুর শহর
ঝাড়গ্রাম মহকুমা	১৮ আগস্ট, ২০০৬	দুপুর ১টা	ঝাড়গ্রাম মহকুমা অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তর।
ঘাটাল মহকুমা	২২ আগস্ট, ২০০৬	দুপুর ১টা	ঘাটাল মহকুমা অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তর।
খড়্গপুর মহকুমা	২৩ আগস্ট, ২০০৬	দুপুর ১টা	খড়্গপুর মহকুমা অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তর।

● শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে মিছিল করে সমাবেশস্থলে উপস্থিত হওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

● এই কর্মসূচির পোস্টার জেলা কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে।

● সমিতির বিগত ৮০তম সাধারণ সভার দাবীর ভিত্তিতে এই কর্মসূচির স্মারকলিপি প্রস্তুত করতে হবে। ব্যাপক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীকে এই কর্মসূচিতে সামিল করার উদ্যোগ নিতে হবে।

(ড) নভেম্বর, ২০০৬ জেলাস্তরের শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হবে।

বিষয় ঃ ১। সপ্তম বামফ্রণ্ট সরকার ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ভূমিকা।

২। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সাংগঠনিক কর্তব্য।

৩। সমিতির সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারা।

অমরেশ চক্রবর্তী
সম্পাদক

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

(স্থাপিত—১৯২১)

সত্যপ্রিয় ভবন

পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলকাতা

বুলেটিন

(কেবলই সদস্যদের জন্য)

১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে ৩রা নভেম্বর কেন্দ্রীয় সমাবেশ সফল করুন

আগামী ৩রা নভেম্বর, ২০০৬ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে রানি রাসমণি এভেনিউতে বেলা ১টায় কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। ২০০৬ সালের বার্ষিক সাধারণ সভাগুলি এবং মহকুমাগুলির কার্যকরী কমিটি ও জেলা কাউন্সিলগুলির এক বছরের পালিত কর্মসূচির ওপর সভাগুলি শেষ হয়েছে। এই সভাগুলির রিপোর্ট রাজ্য দপ্তরে আসছে। ৮০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত দাবিগুলি নিয়ে এবং সর্বভারতীয় শিক্ষা কনভেনশনে উত্থিত ১৫ দফা দাবি নিয়ে এইসব সভায় আলোচনা হয়েছে। শেষ হয়েছে মহকুমার অতিরিক্ত জেলা পরিদর্শকের দপ্তরের সামনে উল্লিখিত দাবিগুলির ভিত্তিতে সমাবেশ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি। পূর্বে ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী **৩রা নভেম্বর, ২০০৬-এ এবার অনুষ্ঠিত হবে কেন্দ্রীয় সমাবেশ। স্থান ঃ রানি রাসমণি এভেনিউ, কলকাতা। সময় ঃ বেলা ১টা।** এই সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে মহোদয়। সমিতির পক্ষ থেকে আমরা তাঁর হাতে দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেব। কিছু দাবি আছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, কিছু দাবি আছে রাজ্য সরকারের কাছে।

কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার আজ সাম্রাজ্যবাদের ছোট অংশীদার হিসেবে কাজ করে চলেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের সরকারকে শুধু স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার করার শর্ত চাপিয়ে দেয় নি, তারা আমাদের দেশে কৃষি গবেষণা সহ কৃষক ও কৃষকের স্বার্থের পরিপন্থী সমস্ত ক্ষেত্রেই শর্ত আরোপ করে চলেছে। সেই শর্ত মেনে এন ডি এ সরকারের মতো ইউ পি এ সরকার একটির পর একটি কৃষকমারা নীতি নিয়ে চলেছে। তারই পরিণতিতে দেশের কয়েক হাজার কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। কৃষিতে সরকারী বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে কমেছে। এখন চুক্তিপ্রথায় চাষ, ১০০ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগ সহ কর্পোরেট প্রথায় চাষ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ না দেবার ঘটনা ঘটে চলেছে। সাম্রজ্যবাদ তোষণনীতির ফলে ১ লক্ষ ১৬ হাজার মানুষ কাজ হারিয়েছে।

লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে বেসরকারীকরণের পথ প্রশস্ত করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ব্যাঙ্ক, বিমানবন্দর, বীমা ও টেলিকম ক্ষেত্রে বিদেশী লগ্নি বৃদ্ধির পথ থেকে সরকারকে সরানো যায়নি।

ই পি এফ, জি পি, এফ এবং স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার কমিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ এবং প্রবীণ নাগরিকের স্বার্থহানি করেছে।

শ্রমিক, কর্মচারীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও কন্ট্রিবিউটরী পেনসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং পেনসন ফাণ্ড রেগুলেটরি অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট

অথরিটি বিল গ্রহণ করে পেনসন তহবিলকে বেসরকারী পুঁথির স্বার্থে শেয়ার বাজারে পাঠাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কেন্দ্রীয় সরকার। তাই সমিতির দাবি অবিলম্বে সর্বনাশা কন্ট্রিবিউটরি পেনসন স্কীম প্রত্যাহার করতে হবে। গত ১৮ই আগস্ট দিল্লিতে নয়া পেনসন ব্যবস্থা ও পেনসন বিল প্রত্যাহারের দাবিতে সংসদ অভিযানে সামিল হয়েছে সমিতি এস টি এফ আই-এর অন্তর্ভুক্ত সংগঠন হিসাবে। এস টি এফ আই-এর পক্ষ থেকে এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে ঐ সমাবেশে।

সারাভারত রাজ্য সরকারী-কর্মচারী ফেডারেশন, কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারী কনফেডারেশন, ডিফেন্স এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, ভারতের স্কুল টিচার্স ফেডারেশন এবং সারাভারত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এই সংসদ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

ধর্মঘটের অধিকারও আর থাকবে না। শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-মেহনতী মানুষের সংগ্রামের এই গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারটি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তাই আমাদের সুস্পষ্ট দাবি সরকারী কর্মচারী সহ সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীর ধর্মঘটের অধিকার নিশ্চিত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

আমাদের দাবি শিক্ষাকে রাজ্য তালিকাভুক্ত করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকায় রেখে দিয়েছে শুধু রাজ্যগুলির ওপর খবরদারি করার জন্য। শিক্ষার অধিকার বিল ২০০৪, শিক্ষার অধিকার বিল ২০০৫-এর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে রাজ্যগুলির সমর্থনের অভাবে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার সংসদকে না জানিয়ে তাড়াহুড়ো করে মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল ২০০৬, রাজ্যগুলিকে চুপি চুপি পাঠিয়ে দিয়েছে। ঐ প্রস্তাবে বলেছে কেন্দ্র এই সম্পর্কে আর কোন আইন তৈরী করবে না। রাজ্যগুলিকেই আইন তৈরী করতে হবে। এই বিলে সর্বজনীন আবশ্যিক প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তার কোনো কথারই উল্লেখ নেই। রাজ্যগুলিকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য 'বাজেটে' করের প্রধান এবং প্রথম খাত হবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দ্বিতীয় প্রধান খাত হবে শিক্ষা। বর্তমানে রাজ্যগুলি তার বাৎসরিক আয়-বরাদ্দের ১২ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ ধার্য করে শিক্ষার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান আর্থিক বছরে বরাদ্দ করেছে তার মোট ব্যয়-বরাদ্দের ৪.৩ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকার আজও জিডিপি-র ৬ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করলো না। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে আজ স্বাধীনতার ৬০ বছরেও সকলের কাছে সমমানের শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া গেল না।

উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখন টাকার টোপ ঝুলিয়ে দিয়ে সর্বজনীন শিক্ষার দায়টা রাজ্য সরকারগুলির কাঁধে চাপিয়ে দিতে চাইছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, যে রাজ্য কেন্দ্রের বর্তমান প্রস্তাব পুরোপুরি মান্য করবে না সেই রাজ্য একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সবশিক্ষা অভিযান প্রকল্প বাবদ অনুমোদিত ব্যয়ের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাবে, আর যে রাজ্য অক্ষরে অক্ষরে কেন্দ্রীয় প্রস্তাব মেনে নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে—তারা ঐ প্রকল্প বাবদ অনুমোদিত ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ পাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে। এইসব অপমানজনক কথা শোনানো হচ্ছে।

আমাদের সুস্পষ্ট দাবি হল ঃ অবিলম্বে মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল ২০০৬, কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকেই সর্বজনীন শিক্ষার প্রসারের জন্য সংসদে আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং এর জন্য সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকেই বহন করতে হবে। আমাদের দাবি দরিদ্র মানুষের কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে 'সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচি'কে আন্তরিকভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০৬-০৭ এর রাজ্য বাজেটে মোট যে ৪৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে তার ৬৬৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে শিক্ষার জন্য। শত সীমাবদ্ধতা ও আর্থিক সংকটের মধ্যেও শিক্ষার জন্য সাধ্য মতো ব্যয়-বরাদ্দ করে চলেছে গত ২৯ বছর ধরে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনমুখী শিক্ষা নীতির ফলে এ রাজ্যে সাক্ষরতার প্রসার যেমন ঘটেছে, তেমনই শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়ন ঘটে চলেছে ধারাবাহিকভাবে।

রাজ্য সরকার এখন আর্থিক সংকটও কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে। তাই রাজ্য সরকারের কাছেও আমরা কয়েকটি দাবি রাখছি। যেমন, শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ন্যূনতম ২০ শতাংশ করতে হবে, সর্বক্ষেত্রেই পূর্ণ সময়ের জন্য শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করতে হবে। কিদওয়াই কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের আরো অগ্রগতি ঘটাতে হবে। প্রবীণ শিক্ষকদের বেতন নবীন অপেক্ষা কম হওয়ার ক্ষেত্রগুলির সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে, চতুর্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ৮-১৬-২৪ ক্রমান্বয়ী বছর অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধির সুযোগ দিতে হবে। প্রতিবন্ধী মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের খরচ দিতে হবে, নতুন শিক্ষাকর্মীদের পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং শূন্যপদে বিনা শর্তে নিয়োগের অনুমতি দিতে হবে, কেবলমাত্র মহার্ঘভাতা প্রাপক বিদ্যালয়গুলিকে গ্র্যান্ট ইন এডের অধীনে আনতে হবে প্রভৃতি।

গত ২৭ জুলাই, ২০০৬ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় পার্থ দে মহোদয়কে সমিতির সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে ২৯ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। সেই দাবিগুলি 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-এর আগস্ট, ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে ঐ দাবিগুলি দু'একটির উল্লেখ করছি।

মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সমাজের মূল প্রবাহের সাথে সম-সুযোগের ভিত্তিতে অগ্রগতির ধারা উন্মুক্ত রাখতে হবে। এম এম যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক সিনিয়র মাদ্রাসায় নিয়োগ পেলে শুরু থেকেই স্নাতকদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রম পান অথচ ঐ একই যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক জুনিয়র হাই-মাদ্রাসা অথবা হাই-মাদ্রাসায় নিয়োগ পেলে ৫ বছর স্নাতকদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রম পাচ্ছেন; এটা বন্ধ করে সকলেই যেন শুরু থেকেই ঐ বেতনক্রম পান তার ব্যবস্থা করা হোক।

শিক্ষাকর্মীরা বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এঁদের কাজের নির্দিষ্ট কোনো পরিধি নেই। শুধু তাই নয়, আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাকর্মীদের সুনির্দিষ্ট কোন করণীয় কর্মতালিকা তৈরী করা হয়নি। বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ বিদ্যালয়ের সময়ের মধ্যে এবং তার বাইরেও এঁদের করতে হয়। পূর্বে একবার অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ সরকারীভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা কর্মীদের (করণিক ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মী) রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় প্রতি ১০ বছর অন্তর উচ্চতর বেতনক্রম দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

কলকাতার উচ্চ আদালতের নির্দেশে রাজ্যের ৩৬টি বি এড এবং প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রের স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই ধরণের নতুন কলেজগুলিকে অনুমোদন দেওয়ার আগে রাজ্য সরকারকেও সতর্ক থাকতে হবে। খুঁটিয়ে দেখতে হবে এরা ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশনের (এন সি টি ই) শর্তগুলি যথাযথভাবে পালন করছে কিনা। এই সমস্ত কলেজের ভর্তি ফি'র বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন। ভর্তি ফি'র একটা উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন। এন সি টি ই আইন যাতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সংশোধিত হয়, এন সি টি ই-র অনুমোদনহীন বি এড কলেজের ডেপুটেড শিক্ষক শিক্ষিকাদের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি যাতে না হয় এবং ৩৬টি বি এড কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যাতে ২০০৫-০৬ এর বি এড পরীক্ষায় বসতে পারে সেজন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অনুমোদিত বি এড কলেজগুলি সেশন শুরু করে দিচ্ছে। সমস্ত শিক্ষক তাতে স্থান পাননি। অথচ ৫ বছর হয়ে গেছে এবং ঐ কয়েকটি কলেজে স্থান পাননি এমন শিক্ষকদের যাতে আর্থিক ক্ষতি না হয় তা দেখতে হবে।

ইতোমধ্যে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অর্থমন্ত্রীকে পত্র দিয়ে ৫০ শতাংশ ডি এ মূল বেতনের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। ঐ পত্রে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শারদোৎসবের জন্য একসগ্রেসিয়া হিসাবে চারশত টাকা করে দেবার জন্য দাবি জানানো হয়েছে।

এই সমস্ত দাবি ৩রা নভেম্বরের কেন্দ্রীয় সমাবেশে তুলে ধরা হবে।

ইতোমধ্যে ২২শে নভেম্বর এস টি এফ আই-এর নেতৃত্বে যে ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে দিল্লিতে সংসদ অভিযান হবে সে দাবিগুলি বুলেটিন মারফৎ প্রচার করা হয়েছে এবং সাধারণ সভাগুলিতে এই দাবিগুলি আলোচিত হয়েছে।

৩রা নভেম্বরের কেন্দ্রীয় সমাবেশে পুনরায় ঐ দাবিগুলি প্রচার করে ২২শে নভেম্বরের দিল্লি অভিযানকে সফল করার আহ্বান জানানো হবে। সমিতির পক্ষ থেকে ২০০ জন প্রতিনিধি ঐ অভিযানে অংশগ্রহণ করবেন।

যে ১৬ দফা দাবির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনসমূহ ১৪ই নভেম্বর, ২০০৬ দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছে ঐ দাবিগুলির প্রতিও সমর্থন জানাবে সমিতি ঐ সমাবেশে।

৩রা নভেম্বরের কেন্দ্রীয় সমাবেশে ১৪ই ডিসেম্বর দেশব্যাপী ধর্মঘটকে সফল করার শপথ গ্রহণ করা হবে।

সুতরাং এই কেন্দ্রীয় সমাবেশ গুরুত্বপূর্ণ। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে শারদোৎসব ও ঈদ উৎসবের ছুটির আগে ও পরে যে সময়টুকু পাওয়া যাবে তার মধ্যে প্রচার করে এই কেন্দ্রীয় সমাবেশে যাতে ব্যাপকসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সমবেত করা যায় তার উদ্যোগ জেলাগুলিকে গ্রহণ করতে হবে। সফল করতে হবে সমিতির এই কর্মসূচিকে।

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি জিন্দাবাদ!

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-ছাত্র-অভিভাবক ঐক্য জিন্দাবাদ!!

শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক যুক্ত আন্দোলন কমিটি পশ্চিমবঙ্গ
(১২ই জুলাই কমিটি)
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখা

তারিখ ঃ ০১.০৮.০৬

সম্পাদক / যুগ্ম-সম্পাদক,
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

প্রিয় কমরেড,

বিগত ০৪.০৭.২০০৬ তারিখের পত্র দ্বারা সংগঠনের ৪০ বৎসর পূর্তি তথা ৪১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের যে সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছিল আশাকরি তা গুরুত্বের সাথে কার্যকরী করা হয়েছে। সদর মহকুমার ৩টি ব্লক ব্যাতীত কোন স্তর থেকেই কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। দ্রুত রিপোর্ট প্রেরণের অনুরোধ জানাচ্ছি। জেলা সদরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে প্রায় ৬ শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষকের উপস্থিতির মধ্যদিয়ে উৎসাহের সাথেই দিনটি প্রতিপালিত হয়েছে।

আগামী কর্মসূচী প্রসঙ্গে ঃ—

কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। তার পূর্বে ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে জেলা ও মহকুমা স্তরের সাংগঠনিক কনভেনশন করে নিতে হবে। রাজ্য কনভেনশনের পরে ব্লক কনভেনশনের বিষয় বিবেচনা করতে হবে। জেলায় অক্টোবরে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত হবে।

পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তৎপরতা ও নয়া উদারনৈতিক পূঁজিবাদী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের নির্লজ্জ ভূমিকা সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আত্মসমর্পন শ্রমজীবীদের সামনে প্রসারিত ঐক্যের ভিত্তিতে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। তাই আগামী দিনে যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচীগুলিতে সর্বস্তরে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

তহবিল প্রসঙ্গে ঃ—

অপরদিকে, সংগঠনের তহবিল যেহেতু নিঃশেষিত, তাই কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, আগামী অক্টৌবর, ০৬ এর বেতন থেকে ১০ টাকার কূপনে অর্থ সংগ্রহ করা হবে। জেলাকমিটির ২৮.০৭.০৬ এর সভা থেকে এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

১। আগষ্ট, ০৬ এর মধ্যে সংগঠনগুলির চাহিদা মত কূপন ছেপে সেপ্টেম্বর, ০৬ এর প্রথম অর্ধের মধ্যেই দিয়ে দিতে হবে। মোট ৩৫ হাজার কূপন ছাপানো হবে।

২। কূপনে অর্থসংগ্রহের পূর্ণ দায়িত্ব সংগঠনগুলির উপর ন্যস্ত থাকবে এবং সংগৃহীত অর্থ নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী ৩০শে নভেম্বর, ০৬ এর মধ্যে জেলা কমিটিতে জমা দিতে হবে।

৩। সমূহ এই কাজের দায়িত্বে থাকবেন কমঃ দেবাশীষ চ্যাটার্জী।

সাংগঠনিক কনভেনশন ঃ—

৪। আগামী জানুয়ারী মাসে সংগঠনের রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে।

৫। হাওড়া ডিভিশন বীমা কর্মচারী সমিতির ২০ বর্ষ পূর্তি উৎসব আগামী ৩রা আগষ্ট, ০৬ রবীন্দ্র ইনস্টিটিউট খড়্গপুরে হবে। মহকুমা স্তরে সব সংগঠন যাতে কর্মীদের নিয়ে ভাল সংখ্যায় উপস্থিত হন তার নির্দেশ দেবেন। জেলা কমিটি থেকে কমঃ মানিক সেনগুপ্ত উপস্থিত থাকবেন।

সিদ্ধান্ত সমূহ কার্য্যকরী করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

অনিল চাকী
অপরেশ ভট্টাচার্য
সংগ্রামী অভিনন্দন সহ
যুগ্ম আহ্বায়ক

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

গোলকপতি ভবন
রবীন্দ্রনগর মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর
দূরভাষ ঃ ০৩২২২-২৭৫২৬৮

জেলা সার্কুলার—৫/২০০৬ তাং—১২.০৭.২০০৬

জেলা সম্পাদক মণ্ডলী সদস্য, মহকুমা সম্পাদক ও আঞ্চলিক শাখা সম্পাদকদের প্রতি—

প্রিয় বন্ধু,

গত ১১.০৭.২০০৬ তারিখের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি অবিলম্বে কার্যকর করতে অনুরোধ জানাই।

অভিনন্দন সহ

অপরেশ ভট্টাচার্য, সম্পাদক

সিদ্ধান্ত সমূহ ঃ

১। **সদস্য সংগ্রহ**—২০০৬-০৭ সালে মোট ১১,১৬৪টি সদস্যপদ সংগৃহীত হয়েছে। ১০,৮৯৭টি সদস্যপদ কেন্দ্রীয় দপ্তরে জমা পড়েছে। ২৬৭টি সদস্যপদ জেলায় জমা আছে। আগস্ট '০৬ মাসের মধ্যে সদস্য সংগ্রহের কাজ শেষ করতে হবে।

মহকুমা ভিত্তিক সদস্য সংগ্রহের পরিসংখ্যান ঃ

মহকুমা		লক্ষ্যমাত্রা	সংগৃহীত সদস্যপদ
সদর	—	২৪১০	২৫৩৯
খড়্গপুর	—	৪২১৬	৪৪২২
ঝাড়গ্রাম	—	১৮৯৮	২০১৬
ঘাটাল	—	২১৩৪	২১৮৭
		১০,৬৫৮	১১,১৬৪

বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ

নিম্নলিখিত তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্তরের বার্ষিক সাধারণ সভা কর্মসূচি শেষ করতে হবে।

ইউনিট স্তর ঃ ২০ জুন '০৬ থেকে ২০ জুলাই '০৬-এর মধ্যে শেষ করতে হবে।

আঞ্চলিক স্তর ঃ ২১ জুলাই '০৬ থেকে ১৫ আগস্ট '০৬ তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে।

আঞ্চলিক শাখাগুলির বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ, সময়, স্থান নির্দিষ্ট করে জেলা দপ্তর ও মহকুমা দপ্তরকে অবহিত করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে সভার তারিখ যাতে অপরিবর্তিত থাকে।

বার্ষিক সাধারণ সভা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জোন এলাকায় কতগুলি ইউনিটের মধ্যে কয়টিতে সাধারণ সভা হয়েছে, সভায় সদস্যদের উপস্থিতির সংখ্যা এবং প্রতিবেদন সহ জেলা দপ্তরে লিখিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনা সংক্রান্ত বুলেটিন মহকুমা শাখার মাধ্যমে আঞ্চলিক শাখা এবং ইউনিট স্তর পর্যন্ত পৌচেছে। ঐ বুলেটিনের ভিত্তিতে বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে।

আঞ্চলিক শাখাগুলির বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ, উপস্থিত জেলা নেতৃত্বের নাম ঃ

	তারিখ	আঞ্চলিক শাখা	জেলা নেতৃত্ব
১।	২২.০৭.০৬	বেলদা	অনিল পট্টনায়েক, অশোক ঘোষ
২।	২৩.০৭.০৬	ঝাড়গ্রাম গ্রামীণ	অপরেশ ভট্টাচার্য, মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, সুশীল গোস্বামী
৩।	২৯.০৭.০৬	ঝাড়গ্রাম শহর	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, অনিল পট্টনায়েক
৪।	৩০.০৭.০৬	বেলপাহাড়ী	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, অনিল পট্টনায়েক
৫।	৩০.০৭.০৬	বিনপুর	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, অনিল পট্টনায়েক
৬।	০৫.০৮.০৬	লালগড়	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ
৭।	২৬.০৮.০৬	কেশপুর	বাসন্তী ভট্টাচার্য, গদাধর বারিক
৮।	০৫.০৮.০৬	মেদিনীপুর গ্রামীণ	অশোক ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ দত্ত

	তারিখ	আঞ্চলিক শাখা	জেলা নেতৃত্ব
৯।	০৫.০৮.০৬	মেদিনীপুর শহর	অশোক মণ্ডল, সুশীল গোস্বামী, বাসন্তী ভট্টাচার্য, অপরেশ ভট্টাচার্য
১০।	০৬.০৮.০৬	গোয়ালতোড়	বাসন্তী ভট্টাচার্য
১১।	০৬.০৮.০৬	গোপীবল্লভপুর-১	অনিল পট্টনায়েক, অশোক মণ্ডল
১২।	০৬.০৮.০৬	গোপীবল্লভপুর-২	অনিল পট্টনায়েক, অশোক মণ্ডল
১৩।	০৬.০৮.০৬	সাঁকরাইল	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, সুশীল গোস্বামী, অপরেশ ভট্টাচার্য
১৪।	০৬.০৮.০৬	পিংলা	রবীন্দ্রনাথ দত্ত
১৫।	০৬.০৮.০৬	দাসপুর-২	গদাধর বারিক, রবীন্দ্রনাথ দত্ত
১৬।	০৬.০৮.০৬ (১১.০৮.০৬)	সবং পূর্ব	অশোক ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, অপরেশ ভট্টাচার্য
১৭।	০৮.০৮.০৬	শালবনী	অপরেশ ভট্টাচার্য, গদাধর বারিক
১৮।	০৯.০৮.০৬	গড়বেতা	বাসন্তী ভট্টাচার্য, অশোক ঘোষ, সুশীল গোস্বামী, অপরেশ ভট্টাচার্য
১৯।	০৯.০৮.০৬	চন্দ্রকোনা রোড	বাসন্তী ভট্টাচার্য, গদাধর বারিক, অপরেশ ভট্টাচার্য
২০।	১১.০৮.০৬ (২২.০৮.০৬)	সবং পশ্চিম	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, সুশীল গোস্বামী, অশোক ঘোষ
২১।	১১.০৮.০৬ (২০.০৮.০৬)	কেশিয়াড়ী	অশোক মণ্ডল, অশোক ঘোষ
২২।	১৩.০৮.০৬ (০৬.০৮.০৬)	মোহনপুর	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, সুশীল গোস্বামী
২৩।	১৩.০৮.০৬	জাম্বনী	অশোক মণ্ডল
২৪।	১৩.০৮.০৬	নয়াগ্রাম	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, অনিল পট্টনায়েক
২৫।	২০.০৮.০৬	ঘাটাল	রবীন্দ্রনাথ দত্ত, অপরেশ ভট্টাচার্য
২৬।	১৩.০৮.০৬ (১৯.০৮.০৬)	চন্দ্রকোনা	গদাধর বারিক, বাসন্তী ভট্টাচার্য
২৭।	১৩.০৮.০৬	ক্ষীরপাই	বাসন্তী ভট্টাচার্য, গদাধর বারিক
২৮।	১৯.০৮.০৬	ডেবরা	রবীন্দ্রনাথ দত্ত, অশোক ঘোষ, অপরেশ ভট্টাচার্য
২৯।	১৯.০৮.০৬	নারায়নগড়	অশোক ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ
৩০।	২০.০৮.০৬ (১৮.০৮.০৬)	দাঁতন-১	অনিল পট্টনায়েক, অশোক ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ দত্ত
৩১।	২০.০৮.০৬	দাসপুর-১	গদাধর বারিক, রবীন্দ্রনাথ দত্ত
৩২।	২০.০৮.০৬	খড়্গপুর গ্রামীণ-১	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ
৩৩।	২৬.০৮.০৬	খড়্গপুর গ্রামীণ-২	অশোক ঘোষ, অশোক মণ্ডল
৩৪।	২৬.০৮.০৬	দাঁতন-২	অনিল পট্টনায়েক, সুশীল গোস্বামী, মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ
৩৫।	২৬.০৮.০৬	খড়্গপুর শহর	অশোক ঘোষ, অশোক মণ্ডল

- কোন আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভায় দুই-এর অধিক জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য উপস্থিত থাকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করে নিতে হবে, কোন কোন দুজন বক্তব্য রাখবেন। বক্তব্য যতটা সম্ভব সংক্ষেপে রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ঃ

নিম্নলিখিত তারিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট স্তরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষ করতে হবে ঃ—

- ৩১ জুলাই '০৬ তারিখের মধ্যে ইউনিট স্তরের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষ করতে হবে।
- ১৫ আগস্ট '০৬ তারিখের মধ্যে আঞ্চলিক শাখাস্তরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষ করতে হবে।
- ৩০ আগস্ট '০৬ তারিখের মধ্যে মহকুমা শাখাস্তরের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষ করতে হবে।

মহকুমা শাখা এবং আঞ্চলিক শাখাগুলির সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার তারিখ, সময়, স্থান সুনির্দিষ্ট করে জেলা দপ্তরে জমা দিতে হবে।

আঞ্চলিক ও মহকুমা শাখাগুলির সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার শেষে লিখিত রিপোর্টের মাধ্যমে কত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল উল্লেখ করতে হবে।

জেলা কমিটির দ্বারা প্রেরিত নির্দিষ্ট প্রো-ফর্মা সঠিকভাবে পূরণ করে জেলা দপ্তরে জমা দিতে হবে।

- আগামী ২০ জুলাই '০৬ সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর সত্যপ্রিয় ভবনে বেলা ২টায় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় পার্থ দে মহাশয়কে সমিতির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই কর্মসূচিতে মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলী সদস্যবৃন্দ

এবং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দকে উপস্থিত থাকতে হবে।

কর্মসূচিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য মহকুমা সম্পাদকদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জেলা শাখা প্রত্যেকটি মহকুমাকে গাড়ী খরচ বাবদ ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা করে দেবে।

- আগামী ১২ আগস্ট STFI-এর প্রতিষ্ঠা দিবস। জেলা কেন্দ্র STFI-এর পতাকা উত্তোলন এবং একটি আলোচনা সভার মাধ্যমে দিনটি পালন করবে। মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে বেলা ২টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

নিম্নে মহকুমা ভিত্তিক ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হল ঃ

খড়্গপুর—৩০০, ঘাটাল—১০০, সদর—২০০, ঝাড়গ্রাম—৫০। জেলা কাউন্সিল সদস্য / মহকুমা কমিটির সদস্যদের এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

- ১৩ আগস্ট '০৬ তারিখ সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর সত্যপ্রিয় ভবনে মাদ্রাসা শিক্ষকদের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। এই কনভেনশনে মাদ্রাসা ও সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী ড. আবদুস সাত্তার বক্তব্য রাখবেন। সভায় তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। আমাদের জেলায় ১৬টি মাদ্রাসা বিদ্যালয় থেকে ১৬ জন সদস্যকে ঐ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। এই বিষয়ে আঞ্চলিক শাখা সম্পাদক এবং মহকুমা সম্পাদকদের উদ্যোগী হতে হবে।
- সমিতির ৮০তম বার্ষিক সাধারণ সভার দাবীর ভিত্তিতে ব্যাপক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সমাবেশের মাধ্যমে মহকুমা ভিত্তিক অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তরে / সদর মহকুমার ক্ষেত্রে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তরে সমাবেশ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে।

নিম্নলিখিত তারিখে মহকুমাগুলির সমাবেশ সংগঠিত হবে ঃ

সদর মহকুমা	১৭ আগস্ট '০৬	দুপুর ১টা	জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তর, মেদিনীপুর শহর
ঝাড়গ্রাম মহকুমা	১৮ আগস্ট '০৬	বেলা ১২টা	ঝাড়গ্রাম মহকুমা অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তর
ঘাটাল মহকুমা	২২ আগস্ট '০৬	দুপুর ১টা	ঘাটাল মহকুমা অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তর
খড়্গপুর মহকুমা	২৩ আগস্ট '০৬	দুপুর ১টা	খড়্গপুর মহকুমা অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তর

- সমিতির বিগত ৮০তম বার্ষিক সাধারণ সভার দাবির ভিত্তিতে এই কর্মসূচির স্মারকলিপি প্রস্তুত করতে হবে।
- এই কর্মসূচির পোস্টার জেলা কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে।
- শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে মিছিল করে সমাবেশ স্থলে উপস্থিত হওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

নভেম্বর '০৬ জেলা স্তরের শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হবে ঃ

বিষয় ঃ— ১। সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ভূমিকা।
২। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সাংগঠনিক কর্তব্য।
৩। সমিতির সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারা।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

গোলকপতি ভবন
রবীন্দ্রনগর মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর
দূরভাষ ঃ ০৩২২২-২৭৫২৬৮

জেলা সার্কুলার— তাং—১১.০৮.২০০৬

জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের প্রতি—

প্রিয় বন্ধু,

আপনাদের অবগতির জন্য জানাই যে, কয়েকটি আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ পরিবর্তন হয়েছে। নিম্নে পরিবর্তিত তারিখগুলি উল্লেখ করা হল।

অভিনন্দন সহ
অপরেশ ভট্টাচার্য, *সম্পাদক*

আঞ্চলিক শাখা	পূর্ব নির্দ্ধারিত তারিখ	পরিবর্তিত তারিখ	জেলা নেতৃত্ব
সবং পূর্ব	০৬.০৮.০৬	১১.০৮.০৬	অশোক ঘোষ, অপরেশ ভট্টাচার্য

দাঁতন-১	২০.০৮.০৬	১৮.০৮.০৬	অনিল পট্টনায়েক, অশোক ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ দত্ত
চন্দ্রকোনা	১৩.০৮.০৬	১৯.০৮.০৬	গদাধর বারিক, বাসন্তী ভট্টাচার্য
কেশিয়াড়ী	১১.০৮.০৬	২০.০৮.০৬	অশোক মণ্ডল, অশোক ঘোষ
ঘাটাল	১৩.০৮.০৬	২০.০৮.০৬	রবীন্দ্রনাথ দত্ত, অপরেশ ভট্টাচার্য, সুশীল গোস্বামী
সবং পশ্চিম	১১.০৮.০৬	২২.০৮.০৬	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, সুশীল গোস্বামী, অশোক ঘোষ
কেশপুর	০৫.০৮.০৬	২৬.০৮.০৬	বাসন্তী ভট্টাচার্য, গদাধর বারিক
মোহনপুর	১৩.০৮.০৬	২৬.০৮.০৬	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, সুশীল গোস্বামী

নিম্নলিখিত আঞ্চলিক শাখাগুলিব তারিখ সংযোজিত হয়েছে

তারিখ	আঞ্চলিক শাখা	জেলা নেতৃত্ব
২০.০৮.২০০৬	দাসপুর-১	অপরেশ ভট্টাচার্য, গদাধর বারিক, রবীন্দ্রনাথ দত্ত
২০.০৮.২০০৬	খড়্গপুর গ্রামীণ-১	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ
২৬.০৮.২০০৬	খড়্গপুর গ্রামীণ-২	অশোক ঘোষ, অশোক মণ্ডল
২৬.০৮.২০০৬	দাঁতন-২	অনিল পট্টনায়েক, সুশীল গোস্বামী, মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ
২৬.০৮.২০০৬	খড়্গপুর শহর	অশোক ঘোষ, অশোক মণ্ডল

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

গোলকপতি ভবন

রবীন্দ্রনগর মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর

দূরভাষ ঃ ০৩২২২-২৭৫২৬৮

জেলা সার্কুলার— তাং—১১.০৮.২০০৬

আঞ্চলিক শাখা সম্পাদক, মহকুমা সম্পাদক ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের প্রতি—

প্রিয় বন্ধু,

গত ১০ আগস্ট '০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আঞ্চলিক শাখাগুলির বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ ও উপস্থিত জেলা নেতৃত্বের নামের তালিকা পাঠানো হল। অবিলম্বে কার্যকর করতে অনুরোধ জানাই।

অভিনন্দন সহ

অপরেশ ভট্টাচার্য

সম্পাদক

আঞ্চলিক শাখাগুলির বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ ও উপস্থিত জেলা নেতৃত্বের নামের তালিকা ঃ

	তারিখ	আঞ্চলিক শাখা	জেলা নেতৃত্ব
১।	২২.০৭.০৬	বেলদা	অনিল পট্টনায়েক, অশোক ঘোষ
২।	২৩.০৭.০৬	ঝাড়গ্রাম গ্রামীণ	অপরেশ ভট্টাচার্য, মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, সুশীল গোস্বামী
৩।	২৯.০৭.০৬	ঝাড়গ্রাম শহর	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, অনিল পট্টনায়েক
৪।	৩০.০৭.০৬	বেলপাহাড়ী	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, অনিল পট্টনায়েক
৫।	৩০.০৭.০৬	বিনপুর	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, অনিল পট্টনায়েক
৬।	০৫.০৮.০৬	লালগড়	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, সুশীল গোস্বামী
৭।	০৫.০৮.০৬	মেদিনীপুর গ্রামীণ	অশোক ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ দত্ত
৮।	০৫.০৮.০৬	মেদিনীপুর শহর	অশোক মণ্ডল, অপরেশ ভট্টাচার্য, বাসন্তী ভট্টাচার্য
৯।	০৬.০৮.০৬	গোয়ালতোড়	বাসন্তী ভট্টাচার্য
১০।	০৬.০৮.০৬	গোপীবল্লভপুর-১	অনিল পট্টনায়েক, অশোক মণ্ডল

১১।	০৬.০৮.০৬	গোপীবল্লভপুর-২	অনিল পট্টনায়েক, অশোক মণ্ডল
১২।	০৬.০৮.০৬	সাঁকরাইল	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, সুশীল গোস্বামী, অপরেশ ভট্টাচার্য
১৩।	০৬.০৮.০৬	পিংলা	রবীন্দ্রনাথ দত্ত
১৪।	০৬.০৮.০৬	দাসপুর-২	গদাধর বারিক, রবীন্দ্রনাথ দত্ত
১৫।	০৮.০৮.০৬	শালবনী	অপরেশ ভট্টাচার্য, গদাধর বারিক
১৬।	০৯.০৮.০৬	গড়বেতা	বাসন্তী ভট্টাচার্য, অশোক ঘোষ, সুশীল গোস্বামী
১৭।	০৯.০৮.০৬	চন্দ্রকোনা রোড	বাসন্তী ভট্টাচার্য, গদাধর বারিক, অপরেশ ভট্টাচার্য
১৮।	১১.০৮.০৬	সবং পূর্ব	অশোক ঘোষ, অপরেশ ভট্টাচার্য
১৯।	১৩.০৮.০৬	জাম্বনী	অশোক মণ্ডল
২০।	১৩.০৮.০৬	নয়াগ্রাম	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, অনিল পট্টনায়েক, সুশীল গোস্বামী
২১।	১৩.০৮.০৬	ক্ষীরপাই	বাসন্তী ভট্টাচার্য, গদাধর বারিক
২২।	১৮.০৮.০৬	দাঁতন-১	অনিল পট্টনায়েক, অশোক ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ দত্ত
২৩।	১৯.০৮.০৬	চন্দ্রকোনা	গদাধর বারিক, বাসন্তী ভট্টাচার্য
২৪।	১৯.০৮.০৬	ডেবরা	রবীন্দ্রনাথ দত্ত, অশোক ঘোষ, অপরেশ ভট্টাচার্য
২৫।	১৯.০৮.০৬	নারায়ণগড়	অশোক ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ
২৬।	২০.০৮.০৬	ঘাটাল	রবীন্দ্রনাথ দত্ত, অপরেশ ভট্টাচার্য, সুশীল গোস্বামী
২৭।	২০.০৮.০৬	দাসপুর-১	গদাধর বারিক, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, অপরেশ ভট্টাচার্য
২৮।	২০.০৮.০৬	খড়্গপুর গ্রামীণ-১	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ
২৯।	২২.০৮.০৬	সবং পশ্চিম	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, সুশীল গোস্বামী, অশোক ঘোষ
৩০।	২৬.০৮.০৬	কেশপুর	বাসন্তী ভট্টাচার্য, গদাধর বারিক
৩১।	২৬.০৮.০৬	মোহনপুর	মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, সুশীল গোস্বামী
৩২।	২৬.০৮.০৬	খড়্গপুর গ্রামীণ-২	অশোক ঘোষ, অশোক মণ্ডল
৩৩।	২৬.০৮.০৬	দাঁতন-২	অনিল পট্টনায়েক, সুশীল গোস্বামী
৩৪।	২৬.০৮.০৬	খড়্গপুর শহর	অশোক ঘোষ, অশোক মণ্ডল
৩৫।	২০.০৮.০৬	কেশিয়াড়ী	অশোক মণ্ডল, অশোক ঘোষ

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

গোলকপতি ভবন

রবীন্দ্রনগর মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর

দূরভাষ ঃ ০৩২২২-২৭৫২৬৮

জেলা সার্কুলার—৬/২০০৬ তাং—১২.০৮.২০০৬

জেলা সম্পাদকমণ্ডলী, মহকুমা সম্পাদক ও আঞ্চলিক শাখা সম্পাদকদের প্রতি—

প্রিয় বন্ধু,

গত ১০ আগস্ট, ২০০৬ তারিখের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি অবিলম্বে কার্যকর করতে অনুরোধ জানাই।

অভিনন্দন সহ

অপরেশ ভট্টাচার্য

সম্পাদক

সিদ্ধান্ত সমূহ ঃ

১। সদস্যপদ ঃ—২০০৬-০৭ সালে মোট ১১,২৯০টি সদস্যপদ সংগৃহীত হয়েছে। ১১,১৭৮টি সদস্যপদ কেন্দ্রীয় দপ্তরে জমা

পড়েছে। ১১২টি সদস্যপদ জেলা দপ্তরে জমা আছে। আগস্ট '০৬ মাসের মধ্যে সদস্য সংগ্রহের কাজ শেষ করতে হবে।

মহকুমা ভিত্তিক সদস্য সংগ্রহের পরিসংখ্যান ঃ

মহকুমা	সদস্য বিদ্যালয় হাই	জুঃ হাই	ব্যক্তিগত সদস্য	মোট সদস্য
সদর	১৪৫	১৬	৩৭	২৫৩৯
ঝাড়গ্রাম	১২৪	১৮	৫০	২০২২
খড়্গপুর	২৪৩	৪১	১১২	৪৫৩৪
ঘাটাল	১২০	৩২	৬২	২১৯৫
	৬৩২	১০৭	২৬১	১১,২৯০

২। **বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ**—ইউনিট স্তরের বার্ষিক সাধারণ সভার শেষ তারিখ ছিল ২০ জুলাই '০৬ পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশিকা অনুযায়ী ১৫ আগস্ট '০৬ তারিখের মধ্যে আঞ্চলিক শাখাস্তরে বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ শেষ করার কথা থাকলেও কয়েকটি আঞ্চলিক শাখার তারিখ পরিবর্তন হওয়ায় আগামী ২৬.০৮.০৬ তারিখে আঞ্চলিক শাখাস্তরে বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ শেষ হবে।

গত ২২ জুলাই '০৬ তারিখ থেকে ৯ আগস্ট '০৬ তারিখ পর্যন্ত ১৮টি আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩। **সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ঃ**—ইউনিট স্তর ৩১ জুলাই, ২০০৬ তারিখ এবং আঞ্চলিক শাখা স্তরের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৫ আগস্ট, ২০০৬ তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে।

মহকুমা স্তরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার তারিখ ঃ

খড়্গাপুর—২৭.০৮.০৬ সদর—২৭.০৮.০৬ ঝাড়গ্রাম—১৬.০৮.০৬ ঘাটাল—

জেলাস্তরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার তারিখ—১০.০৯.০৬

আঞ্চলিক শাখা ও মহকুমা শাখার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেলে জেলা দপ্তর থেকে প্রেরিত ফরমেটটি পূরণ করে জেলা দপ্তরে জমা দিতে হবে।

মহকুমা স্তরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার স্থান, সময় সম্পর্কে অবিলম্বে লিখিতভাবে জেলা দপ্তরকে অবগত করতে হবে।

৪। **মহকুমাগুলির বর্দ্ধিত সভার তারিখ ঃ—**

সদর—০৩.০৯.০৬ খড়্গাপুর—০২.০৯.০৬ ঘাটাল—০৩.০৯.০৬ ঝাড়গ্রাম—২৩.০৯.০৬

এই সভায় মহকুমায় গৃহীত গত এক বছরের কর্মসূচিগুলির পর্যালোচনামূলক রিপোর্ট তৈরী করে পেশ করতে হবে এবং ঐ রিপোর্ট জেলা দপ্তরে জমা দিতে হবে।

৫। ১২ আগস্ট '০৬ তারিখে এস.টি.এফ.আই.-এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হবে। রাজ্য সরকারী কর্মচারী ভবনে দুপুর ২টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। নিম্নলিখিত হারে মহকুমাগুলিকে সদস্য শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের জমায়েত করতে হবে। সদর—২০০ জন, খড়্গাপুর—৩০০ জন, ঘাটাল—১০০ জন এবং ঝাড়গ্রাম—৫০ জন।

জেলা কাউন্সিল সদস্য/মহকুমা কমিটির সদস্যদের বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হতে হবে।

৬। ১৩ আগস্ট '০৬ তারিখে সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর সত্যপ্রিয় ভবনে মাদ্রাসা শিক্ষামন্ত্রী ড. আবদুস সাত্তার মহাশয়কে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। সম্বর্ধনা সভায় জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে তিনজন সদস্যকে উপস্থিত হতে হবে।

একই দিনে মাদ্রাসা কনভেনশনে জেলার ১৬টি মাদ্রাসার ১৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। প্রতিনিধিদের নাম ও বিদ্যালয়ের নাম ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। মাদ্রাসা কনভেনশনে প্রতিনিধিদের উপস্থিত করানোর বিষয়ে আঞ্চলিক ও মহকুমা শাখা সম্পাদকরা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৭। সমিতির ৮০তম বার্ষিক সাধারণ সভার দাবির ভিত্তিতে ব্যাপক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সমাবেশের মাধ্যমে মহকুমা ভিত্তিক অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তরে এবং সদর মহকুমার ক্ষেত্রে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তরে সমাবেশ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে।

নিম্নলিখিত তারিখে মহকুমাগুলির সমাবেশ সংগঠিত হবে ঃ

মহকুমা	তারিখ	সময়	স্থান
সদর—	১৭.০৮.০৬	দুপুর ১টা	জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তর, মেদিনীপুর
ঝাড়গ্রাম—	১৮.০৮.০৬	বেলা ১২টা	ঝাড়গ্রাম মহকুমা অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তর, ঝাড়গ্রাম
ঘাটাল—	২২.০৮.০৬	দুপুর ১টা	ঘাটাল মহকুমা অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তর, ঘাটাল
খড়্গপুর—	২৩.০৮.০৬	দুপুর ১টা	খড়্গপুর মহকুমা অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তর

৮। ১২ই জুলাই কমিটি তহবিল সংগ্রহ করতে হবে। কুপনের মাধ্যমে এই তহবিলের অর্থ সংগৃহীত হবে। তহবিল সংগ্রহের কাজ নভেম্বর '০৬ মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

১০ (দশ) টাকার কুপন প্রত্যেকটি মহকুমাকে দেওয়া হবে। সমিতির প্রত্যেকটি সদস্যের নিকট থেকে কুপনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।

৯। মে-আগস্ট '০৬ মাসের মহকুমা সাংগঠনিক রিপোর্ট প্রস্তুত করে জেলা দপ্তরে জমা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১০। আগামী ১৬ আগস্ট '০৬ তারিখে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সত্যপ্রিয় ভবনে বর্ধমান বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে একদিনের 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-এর লেখক-পাঠিকা সভা অনুষ্ঠিত হবে। কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য ১০ জন আগ্রহী লেখক-পাঠক অংশগ্রহণ করবেন।

১১। পি.ডি. ঃ বকেয়া তালিকা

সদর—	এপ্রিল '০৬—জুলাই '০৬
ঝাড়গ্রাম—	এপ্রিল '০৬—জুলাই '০৬
খড়্গপুর—	মে '০৬—জুলাই '০৬

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

গোলকপতি ভবন

রবীন্দ্রনগর মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর

দূরভাষ ঃ ০৩২২২-২৭৫২৬৮

জেলা সার্কুলার— তাং—২৫.০৮.২০০৬

মহকুমা সম্পাদকদের প্রতি—

প্রিয় বন্ধু,

আগামী ১০ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখে কেরানীতলা শ্রীশ্রীমোহনানন্দ বিদ্যামন্দিরে সকাল ৯টা থেকে সমিতির জেলা স্তরের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট মহকুমাগুলির প্রতিযোগীরা যাতে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়, তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাই।

ইতিমধ্যে আঞ্চলিক শাখাস্তরে বার্ষিক সাধারণ সভা শেষ হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার আঞ্চলিক শাখা ভিত্তিক লিখিত রিপোর্ট অবিলম্বে জেলা দপ্তরে জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মহকুমাগুলির বর্দ্ধিত সভার স্থান, সময়, তারিখ জেলা দপ্তরে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বিগত এক বছরে মহকুমার বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনামূলক রিপোর্ট এই সভায় পেশ করতে হবে। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

অভিনন্দন সহ

অপরেশ ভট্টাচার্য

সম্পাদক

দূরভাষঃ ০৩২২২-২৭৫২৬৮

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখা

গোলকপতি ভবন রবীন্দ্রনগর পশ্চিম মেদিনীপুর

জেলা সার্কুলার—৭/২০০৬ তাং—২৯.০৯.২০০৬

প্রিয় বন্ধু,

গত ২১.০৯.২০০৬ তারিখে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি অবিলম্বে কার্যকর করতে অনুরোধ জানাই।

অভিনন্দন সহ

অপরেশ ভট্টাচার্য

সম্পাদক

সিদ্ধান্ত সমূহ ঃ

১। ২০০৬-০৭ সালে মোট সংগৃহীত সদস্য সংখ্যা—১১,৫০৩
৭৪৬টি বিদ্যালয় সদস্যপদ গ্রহণ করেছে।

মহকুমা ভিত্তিক সদস্য সংগ্রহের পরিসংখ্যান ঃ

সদর মহকুমা— ২৫৬৪
খড়্গপুর মহকুমা— ৪৫৮৯
ঘাটাল মহকুমা— ২২৬৪
ঝাড়গ্রাম মহকুমা— ২০৮৬
———————————
১,১৫০৩

২। বার্ষিক সাধারণ সভার কর্মসূচি শেষ হয়েছে। আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভাগুলির উপস্থিতির হার সন্তোষজনক নয়।
খড়্গপুর মহকুমার উপস্থিতির হার—৩৩.৩১ শতাংশ, সদর মহকুমার উপস্থিতির হার—৫১.৪৪ শতাংশ
ঘাটাল মহকুমার উপস্থিতির হার—২১.০২ শতাংশ, ঝাড়গ্রাম মহকুমার উপস্থিতির হার—২৫.২৩ শতাংশ

৩। চারটি মহকুমায়, মহকুমা সমাবেশ হয়েছে। সদর মহকুমায় ৯৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন। খড়্গপুর মহকুমায় ৭৫৫, ঘাটাল মহকুমায় ২২৯, ঝাড়গ্রাম মহকুমায় ৪৫০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।
সমিতির সদস্য সংখ্যার একটা অংশ এই সমাবেশগুলিতে অনুপস্থিত ছিলেন। সমিতির সদস্যদের জমায়েতের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়াসে সাংগঠনিক শক্তি মজবুত করা প্রয়োজন।

৪। রাজ্যস্তরের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ৫ নভেম্বর '০৬ তারিখে কলকাতার সেন্ট পলস স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে।

৫। মে-আগস্ট '০৬-এর মহকুমা সাংগঠনিক রিপোর্ট ৩০ সেপ্টেম্বর '০৬ তারিখের মধ্যে জেলা দপ্তরে জমা দেওয়ার কথা যে মহকুমা এখনও জমা দেননি অবিলম্বে জমা দিতে হবে।

৬। ১২ই জুলাই কমিটির তহবিল সংগ্রহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মহকুমার মাধ্যমে ১২ই জুলাই কমিটির ১০ টাকার কুপন আঞ্চলিক শাখাগুলি পাবে। নভেম্বর '০৬-এর মধ্যে তহবিল সংগ্রহের কাজ শেষ করতে হবে।
নিম্নলিখিতভাবে মহকুমাগুলিকে কুপন দেওয়া হয়েছে ঃ

সদর মহকুমা— ২০০০টি কুপন—(মোট মূল্য) ২০০০ x ১০/- = ২০,০০০/- টাকা
খড়্গপুর মহকুমা— ৪০০০টি কুপন—(মোট মূল্য) ৪০০০ x ১০/- = ৪০,০০০/- টাকা
ঘাটাল মহকুমা— ২০০০টি কুপন—(মোট মূল্য) ২০০০ x ১০/- = ২০,০০০/- টাকা
ঝাড়গ্রাম মহকুমা— ২০০০টি কুপন—(মোট মূল্য) ২০০০ x ১০/- = ২০,০০০/- টাকা

৭। ৩ ডিসেম্বর '০৬ জেলাস্তরে শিক্ষাকর্মী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যস্তরে শিক্ষাকর্মী কনভেনশন ১০.১২.০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষাকর্মীদের এই দুটি কনভেনশনে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করুন।

৮। জেলাস্তরে শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষাশিবিরে জেলা কাউন্সিলের সকল সদস্য, মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, আঞ্চলিক শাখা সম্পাদকরা উপস্থিত থাকতে পারবেন। বিশেষভাবে ৫ জন শিক্ষাকর্মী, ৫ জন মহিলা, ৮ জন নতুন সক্রিয় ও

মাদ্রাসার ২ জন সদস্যকে শিক্ষাশিবিরে উপস্থিত করানোর উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষাশিবিরের তারিখ, দিন, সময় পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

	শিক্ষাকর্মী	মহিলা	নতুন সক্রিয় সদস্য	মাদ্রাসা সদস্য	
খড়্গপুর	২	২	৩	×	= ৭
সদর	১	১	২	১	= ৫
ঘাটাল	১	১	১	১	= ৪
ঝাড়গ্রাম	১	১	১	১	= ৪

বিষয় ঃ—১। সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ভূমিকা

২। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সাংগঠনিক কর্তব্য

৩। সমিতির সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারা

৯। ৩ নভেম্বর '০৬ তারিখে রানী রাসমণি রোডে বেলা ১টায় সমিতির কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। জেলার পক্ষে ৩৫০০ জন সদস্যকে ঐ সমাবেশে উপস্থিত করানোর উদ্যোগ নিতে আঞ্চলিক শাখাগুলিকে ২০০৬-০৭ সালের সংগৃহীত সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে ২৫-৩০ শতাংশ সদস্যকে উপস্থিত করাতে হবে।

১০। ২৪ ডিসেম্বর '০৬ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে বেলা ১০টায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সমিতির সকল সদস্য সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে পারবে।

১১। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ

১০.১২.২০০৬ তারিখের মধ্যে আঞ্চলিক শাখাস্তরের প্রতিযোগিতা শেষ করতে হবে।

৩১.১২.২০০৬ তারিখের মধ্যে মহকুমা স্তরের প্রতিযোগিতা শেষ করতে হবে।

১৪.০১.২০০৭ তারিখে জেলাস্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

২৭-২৮শে জানুয়ারী, ২০০৭ বহরমপুরে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

১২। এস.টি.এফ.আই.-এর ডাকে আগামী ২২ নভেম্বর '০৬ তারিখে দিল্লীতে সংসদ অভিযান কর্মসূচিতে জেলার পক্ষে ১৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

গোলকপতি ভবন

রবীন্দ্রনগর মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর

দূরভাষ ঃ ০৩২২২-২৭৫২৬৮

জেলা সার্কুলার— তাং—

মহকুমা ও আঞ্চলিক শাখা সম্পাদকদের প্রতি—

প্রিয় সাথী,

আগামী ১২ জুলাই শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক যুক্ত আন্দোলন কমিটি, ১২ই জুলাই কমিটি ৪০ বছর পূরণ করে ৪১ বছরে পদার্পণ করেছে। চতুর্দশ বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিপুল জয় এবং রাজ্যে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়ে ১২ই জুলাই কমিটির এরছর প্রতিষ্ঠা দিবস জেলা, মহকুমা ও ব্লকস্তরে গুরুত্ব সহকারে উদ্‌যাপন করা হবে।

আমাদের জেলাতেও জেলা, মহকুমা ও ব্লকস্তরে এই কর্মসূচি যথাযথভাবে পালন করা হবে। সংশ্লিষ্ট স্তরে নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মহকুমা ও ব্লকস্তরের কর্মসূচিতে মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে ১২ই জুলাই কমিটির মহকুমা ও ব্লকস্তরের কমিটির সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

অভিনন্দন সহ

অপরেশ ভট্টাচার্য

সম্পাদক

School Teachers' Federation Of India

4, Dr. Radhakrishnan Nagar, Abdhullah Street, Choolaimedu, Chennai-600094.

Phone no.- 044-24734062. Mobile no.-9444454832. Email:rajendran-a14@yahoo.co.in

President	Treasurer	Joint General Secretary	General Secretary
Kartik Mandal	**Ch. Subash Chandra Bose**	**A.K. Chandhran**	**K. Rajendran**

March to Parliament

Dear Brother / Sister.

Revolutionary greetings to you ! The secretariat of the STFI met on 11th June 2006 and gave a clarion call for a programme of action. It has been resolved to observe 12th of August the Foundation Day of STFI as Demands Day and to hold conventions all over India to highlight our 15-point charter of demands. The STFI secretariat has also planned a march to the parliament in the month of November.It is the bounden duty of all the members to make those two programmes a grand success. Our demands are just and right but they need to be popularized among our members.

The STFI secretariat makes a fervent appeal to all its members to rally behind the organisation, toachieve our demanbs Come under the banner of STFI ,you are sure to win. Remember comrades, demands are won not just by their justness but by the Pressures that we exert.

The callousness of the government !

The UPA government at the centre has celebrated its second anniversary in Power, but theProblems remain the same .Much has to be done in the field of education.It has to undo the wrong deeds of the previous regime. The NDA government was pursuing a policy of cducation. in the name of Neoliberal reform it chose a ruinous path of commercialization of education. Patriotic people of India voted it out of power and saved the country. It also tried to communalize education by revamping the syllabi, rewriting the text books and distorting history. The UPA was placed in power to set things right. People expect much from the UPA government but unfortunately, the progress is at a snail's pace. We have to shake the government from its lethargy and to trigger it for action.

Right to Strike :

The right to strike is an inalienable right of the working class. But under the grab of 'labour reforms'the ruling classes are trying to take away this hard earned right of the employees. The bureaucracy and the legislature have all joined together to cripple the working class by taking away their rights. The right to collective bargaining is enshrined in our constitution. To say that there is no moral or legal right to strike is to hoodwink the people. The UPA, in its common minimum programme has promised to look into the genuine demands of the working class. But nothing tangible has been done so far.

Spending on Education :

The UPA in its CMP promised to spend 6% of GDP on education. But this promise remains to be fulfilled, and there is a wide gap between the anticipation and the achievement. In a country, where illiteracy, is rampant, it is imperative on the part of the government to spend more on education. But bowing to dictates of the WTO, the government is withdrawing its role of providing education for all. Let us make the government understand that education is not an expenditure but an investment.

Right to Education :

As per the recent amendment to the constitution, the right to education is now a legally guaranteed right. But taking shelter under the loopholes in the Right to Education Act, the governments at the centre and the states shirking their responsibilities. Let us launch a concerted movement to plug the loopholes and to ensure free and compulsory education for all children from the ages of zero to fourteen.

Democratization of the governances :

Even after five decades of independence, our educational agencies are governed by colonial rules and regulation. The government at the centre and the states have to take immediate steps to democratize the governances of all educational bodies and pave way for the participation of people in the policy making process.

March to Delhi !

The STFI secretariat has decided to mobilize thousands of teachers and employees for a march to the parliament.

It is going to be our show of strength. Dear comrades ! Leave no stone unturned to mobilize our members for the demands day on 12th August and for the rally in November.

Siege of Delhi is the call of the organisation !
Take all out efforts to make it a success !
Forget not, 12th August the Demands Day !
In our solidarity rests our success !

STFI ZINDABAD ! TEACHERS' UNITY ZINDABAD

DEMANDS

In order to ensure quantitative, qualitative and inclusive development of education at all levels in accordance with the demands of emerging realities and to ensure the strengthening of secular, democratic, equitable and scientific ethos in the education system, STFI demands that a national commission on education must be constituted to review the entire system of education and proposes the following 15-point agenda of action for the consideration of Central and State Governments and of the people at large.

1. Universalize and ensure implementation of Right to Early Child Care and Education. Upgrade existing anganwadis and set up similar structures wherever they do not exist, link anganwadis with school system. Ensure free and compulsory up to 14 years.
2. Strive for common school system Ensure at least one state funded school within one- kilometer, with mother tongue as medium of instruction. Only recognized schools should be allowed. Recognition should be granted on the basis of constitutional principles of secularism democracy and scientific temper. School management committee shouid not intervene in the day - to day academic affairs, maintenance of discipline of staff and students, and salary disbursement. But it may be a consultative forum. school basedn cadre system should be avoided Keeping these principles in view, right to Educatonal Bill 2005 should be amended.
3. Education cess should be spent fully on state funded school education. Spend at least of 6% of the GDP on education.
4. Integrate vocational proficiency and practical skills within the curriculum so as to develop work culture and employility.
5. No self-financing courses in state funded higher educational institutions More state funded institutions with adequate infrastructure with liberal free ships and scholarships. Introduce courses in new and emerging areas in state-funded institutions. Expand state-funded technical and professional education. Provide adequate funds for research. Respond to social needs and to defend independent and critical thinking.
6. No foreign direct investment in education.
7. Enact central/state law to regulate fees, admission with reservations, curriculum, infrastructure facilities, and salary and service conditions of staff of all unaided institutions. Stop privatization of pension. Increase GPF interest rate.
8. Autonomous status should not be imposed on colleges.
9. No private universities. Existing private universities should seek affiliation as colleges. Scrap the deemed university status granted to private institutions. Bring back the earlier criteria for granting deemed university status. Scrutinize all the deemed universities started in the past 4-5 years on the basis of earlier criteria.
10. NO privatization and commercialization. Education should not be brought under GATS. Initial offers made by the Government of India should be withdrawn.
11. Appoint regular teachers and non-teaching staff. Abolish contract system.
12. No differential fee structure and no like in fees in state-funded institutions. Ensure quality through greater state funding. Decrease the rate of interest on bank loans and provide bank loans without collateral.
13. Democratize the entire system of education. Elections should be held for student unions, teachers' and non-teaching staff associations. Ensure elected representation of students, teaching and non-teaching staff in decision-making bodies. Approve right to strike.
14. Funding should not be linked to assessment and accreditation. Assessment should be transparent, democratic and participatory. It should be conducted state-wise by state agencies.
15. Strengthen academic relevance of higher education in accordance with the goals of national development.

Share Knowledge, Share Development

Ensure sustainable development through quality education for all

All Bengal Teachers' Association

PASCHIM MEDINIPUR DISTRICT COMMITTEE

GOLOKPATI BHABAN ★ RABINDRANAGAR

P.O.—MIDNAPORE ● DIST.—PASCHIM MEDINIPUR

PHONE : (03222) 275266

To

The Heads of High Schools in Paschim Medinipur District.

Dear Friends,

As in previous year also the All Bengal Teachers' Association, Paschim Medinipur District Committee will organise the District Inter-School Madhyamik Test Examination for High Schools from 21.11.2006 (TUESDAY).

The Association hopes that an assessment of the students on the basis of the question papers for the Madhyamik Test Examination will help correct evaluation of their achievements.

We would therefore appeal to the Heads of all high schools to join the Inter-School Madhyamik Test Examination 2006, organised by the Association. Necessary information in this respect is given below.

1. All the schools joining the Examination will have to follow a common programme as given overleaf.
2. Orders in enclosed printed forms may kindly be communicated to the office of the Association so as to reach it on or before 25.09.2006 positively **under the <u>Full signature of the Head of the Institution</u> with the seal of the school concerned and postal address clearly indicated in block letters.**
3. The number of question papers required on each of the Language for compulsory and additional subjects is to be clearly indicated in the order so placed.

   Delivery of Question Papers will not be made by V.V.P. Please state whether delivery of the packets will be taken by the Head of the Institution personally or by his/her authorised messenger from the office. **<u>The Signature in full of the authorised messenger must be attested by the Head of the Institution (in full signature.</u>**
4. **Secrecy of the question papers at all stages should be strictly maintained.**

16th AUGUST, 2006. Yours faithfully,

Aparesh Bhattacharyya

Secretary,

A.B.T.A. Paschim Medinipur District Committee.

CHARGES PAYABLE

[Excluding Packing Charges]

Papers of all subject for every student Rs. 8.00 (Rupees Eight) only

(Including Additional & Oral Subjects)

Map-History & Geography-Per 10 Rs. 2.00 (Rupees Two) only.

A.B.T.A., PASCHIM MEDINIPUR DISTRICT

INTER SCHOOL TEXT EXAMINATION

FOR MADHYAMIK PARIKSHA (S.E.) (CLASS-X) 2006

11.00 A.M. TO 2.00 P.M.

.11.2006	TUESDAY	First language Paper—I Bengali / Hindi [Written Test—90 Marks]
.11.2006	WEDNESDAY	First language Paper—II Bengali / Hindi [Written Test—90 Marks]
3.11.2006	THURSDAY	Second language English [Written Test—100 Marks]
4.11.2006	FRIDAY	Life Science [Written Test—90 Marks]
25.11.2006	SATURDAY	Physical Science [Written Test—90 Marks]
27.11.2006	MONDAY	Geography [Written Test—90 Marks]
28.11.2006	TUESDAY	History [Written Test—90 Marks]
29.11.2006	WEDNESDAY	Mathematics [Written Test—100 Marks]
30.11.2006	THURSDAY	Additional Subject (Except WPS) [Written Test—100 Marks]

*[Any one of the ADDITIONAL subjects detailed below]

ADDITIONAL SUBJECTS : Mathematics / Physics / Chemistry / Biology / Geography / Logic / Psychology / Business Method and Correspondence / Book Keeping / Elements of Economics & Civics / Home Science / Including Home Nursing (for girls) / Additional Bengali / Sanskrit / Hindi B-Level / Pisiculture / Music / Computer appliance / Mechanics / Bengali B-Level / ELEMENTS OF Agriculture and Horticulture.

School may arrange Examination on Additional Physical Education & Work Education according to their own suitablity.

PLEASE SEND YOUR REQUISITION OF TEXT QUESTIONS BY 25.09.2006 (MONDAY)

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

সত্যপ্রিয় ভবন
পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলকাতা-৭০০ ০১৩

সমস্ত সদস্যদের প্রতি
সমিতির ৮১তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ৮১তম বার্ষিক সাধারণ সভা সমিতির গঠনতন্ত্রের X ২১ নম্বর ধারার (ক) ও (খ) এবং ২২ নম্বর ধারার (ক), (খ) ও (গ) অনুযায়ী আগামী ২৪শে ডিসেম্বর, ২০০৬ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী সভাগৃহে বেলা ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে।

সমিতির বৈধ সদস্যগণ ১০ টাকা প্রতিনিধি ফি জমা দিয়ে এই বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

২৪ অক্টোবর, ২০০৬

প্রকাশক ঃ অপরেশ ভট্টাচার্য, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি,
গোলোকপতি ভবন, রবীন্দ্রনগর, পশ্চিম মেদিনীপুর।
ডি.টি.পি. কম্পোজ ও মুদ্রণ সহায়ক ঃ **মা তারা আর্ট প্রেস**, খুকুড়দহ, পশ্চিম মেদিনীপুর।